বি দ্রো হী

মারাদোনা

রূপক সাহা

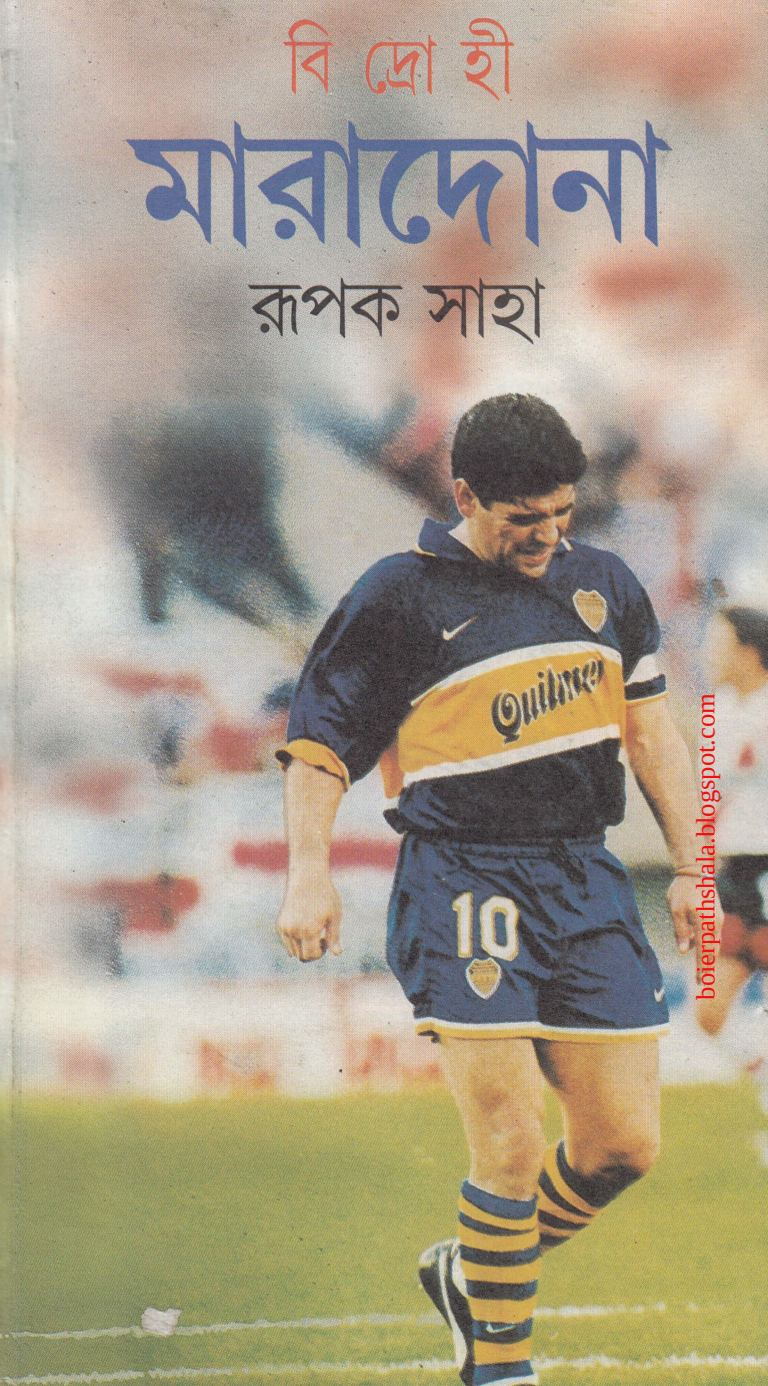

boierpathshala.blogspot.com

বিদেশী মারাদোনা • রূপক সাহা

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

বিদ্রোহী মারাদোনা

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

বিদ্রোহী মারাদোনা

রূপক সাহা

boierpathshala.blogspot.com

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জুন ১৯৯৮

ISBN 81-7215-863-7

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪০·০০

boierpathshala.blogspot.com

যার সঙ্গে ফুটবল নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে,
সেই প্রদীপ ব্যানার্জিকে—

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

মুখবন্ধ

ডিয়েগো মারাদোনার কথা উঠলে আমার কেন জানি না কর্ণের কথা মনে হয়। অর্জুনের মতো কর্ণও ছিল কুন্তীর সন্তান। দু'জনেরই গুরু মহাবীর দ্রোণাচার্য। এবং দু'জনেই ছিলেন মহাবীর। সবরকম তীর ছিল তাঁদের তূণে। তবু শেষপর্যন্ত কর্ণ হয়ে গেলেন মহাকাব্যের ট্র্যাজিক নায়ক। অর্জুনের সঙ্গে সব ব্যাপারে পাল্লা দিয়েও শেষটা ভাল করতে পারেননি।

জানি না, ব্যাসদেবের মতো ফুটবল দেবতাও মারাদোনাকে কেন কর্ণের মতো করে তৈরি করলেন। দু'জনেরই ধাত্রীভূমি লাতিন আমেরিকা। অন্যজন মানে কার কথা বলছি আপনারা জানেন। মাঠের বাইরের কাজকর্মে তাঁরও যে খুব সুনাম তা নয়। যত দিন যাচ্ছে ধরা পড়ে যাচ্ছে দোষেগুণের মানুষ। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করে জিতে গেছেন তাঁর কন্যা, যাকে তিনি পিতৃত্ব দিতে নারাজ। তৃতীয় বিবাহ করে আপাতত সুখেই ঘরসংসার করছেন তিনি। তবে ব্রাজিলের ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে নিজের গদি রাখতে পারেননি। ফিফার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভাল নয়। তা সত্ত্বেও পেলে পেলে। ফুটবল সম্রাট।

মারাদোনা কিন্তু রাজপুত্রই থেকে গেলেন। সেই রাজপুত্র, যাঁকে ডোপিং-এর অপরাধে সাসপেন্ড করলে বিশ্বের সকল ভক্তরা কেঁদে আকুল হয়। পরীক্ষা হয়ে যায় বন্ধ, বিয়েবাড়িতে খেতে বসে উঠে যান বরযাত্রীরা, রাস্তাঘাট থেকে যানবাহন উঠে যায়। আর্জেন্টিনাতে পালিত হয় জাতীয় শোক। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গল্পের ফানুস যতই রঙিন হোক না কেন, স্ত্রী ক্লাউদিয়া এবং দুই কন্যা ডালমা এবং খিয়ানিনিকে নিয়ে তিনি সুখেই ঘরকন্না করেন। অপরাধী মারাদোনাকে আমরা কাঁদতে কাঁদতে বলতে দেখি মেয়েদের নামে আমি শপথ করে বলছি আমি ডোপিং করিনি। এই মারাদোনাকে, দূর থেকে হলেও আমরা চিনি। সারা

boierpathshala.blogspot.com

পৃথিবীতেই মারাদোনার মতো স্নেহশীল পিতা আছেন।

আর ফুটবলার মারাদোনা ? নতুন করে বলার কিছু আছে ? শুধু দুটো ম্যাচের কথা বলব। একটা টপ ফর্মের মারাদোনা। একটা অফ ফর্মের। কিন্তু সূর্যের তেজ তো সূর্যেরই তেজ। ছিয়াশির বিশ্বকাপ ফাইনালটার কথা ভাবুন। জার্মান ফাইটব্যাক করে রুমেনিগেরা ২-২ করে ফেলেছে। গোটা জার্মান টিমটাই তখন গ্রে হাউন্ড কুকুরের মতো আর্জেন্টিনাকে ছিঁড়ে খাওয়ার প্রতীক্ষায়। হঠাৎই নিজেদের মাঝমাঠ থেকে বল ধরে হাফ টার্নে ঘুরে মারাদোনা দেখলেন রাইট উইংয়ে বুরুচাগা দৌড় শুরু করে দিয়েছেন। বাঁ পায়ের একটা নিখুঁত থ্রু পাস। বুরুচাগাকে খুব কষ্ট করতে হয়নি গোলটা করার জন্য। বিশ্বকাপটা ওই একটা পাসেই নিজের হাতে তুলে নিলেন মারাদোনা। একটা মানুষ একটা বিশ্বকাপকে প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রভাবিত করেছে, তা অতীতে দেখা যায়নি। ভবিষ্যতেও মনে হয় যাবে না।

এ তো গেল টপ ফর্মের মারাদোনা। আর অফ ফর্মের ? নব্বইয়ের বিশ্বকাপে ব্রাজিল ম্যাচটার কথা ভাবুন। কারেকা-মুলার-রোমারিওরা অন্তত ছ' গোল মিস করল। যে কোনও সময় ব্রাজিল গোল করবে এরকম একটা ভাবনা ভাবতে ভাবতে আশি মিনিট কাবার। হঠাৎই মারাদোনার আবার একটা থ্রু পাস। এবার গোলটা করলেন ক্যানিজিয়া। ব্রাজিল ওই গোলটাতেই হেরে বিদায় নিল। আর ল্যাংচাতে ল্যাংচাতেই মারাদোনা ফাইনালে তুলে দিলেন আর্জেন্টিনাকে। ছিয়াশি মিনিট অবধি গোলশূন্য রেখে ম্যাচটা পেনাল্টিতে হারলেন মারাদোনারা। টাইব্রেকারে গেলে কী হত কেউ জানে না। সেবার কিন্তু যুগোস্লাভিয়া আর ইতালিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে দিয়েছিল মারাদোনার দল।

বাঁ পায়ে দুর্দান্ত ড্রিবলিং, পাসিং, শট। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির শরীর নিয়ে একটার পর একটা ডিফেন্ডারকে অতিক্রম করে যাওয়া। হেডিং তত ভাল নয়। তবু গোল আছে হেডে। অসাধারণ গেম সেন্স। তৃতীয় নয়ন সবার থাকে না। মারাদোনার ছিল। সবই ছিল। তবু মারাদোনা এই শতাব্দীর

boierpathshala.blogspot.com

সেরা ফুটবলার হলেন না। তা থাকল পেলের জন্য। এবং এ ব্যাপারে কর্ণের মতোই মারাদোনা তুলনীয় জন ম্যাকেনরোর সঙ্গে। ওইরকম প্রতিভা নিয়ে টেনিসে ক'জন এসেছেন ? তবু ম্যাকেনরো তাঁর প্রতিভাকে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধতে পারেননি, মারাদোনার মতোই। ওঁরা তাই রাজপুত্র। সম্রাট নন।

মারাদোনাকে নিয়ে বাংলায় প্রথম সিরিয়াস বই লিখল রূপক সাহা। কলকাতায় সেরা এই ফুটবল সাংবাদিকের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। স্নেহভাজন দু'-চারজনের একজন। ফুটবল ওর রক্তে। ওর বাবা শ্রীযুক্ত হারান সাহা বিশের দশকের ইস্টবেঙ্গলের নামী ফুটবলার ছিলেন। ইনসাইড রাইটে খেলতেন। পঞ্চাশের দশকের শেষে হারানবাবুর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছিল। উনি বলতেন, আমার খেলা নাকি স্ট্যানলি ম্যাথুজের মতো। ভালবেসে বলতেন হয়তো। সত্তর দশকে রূপক এল কলম হাতে। তার আগে ফুটবল যে খেলেনি তা নয়। বড় ফুটবলার না হলে কী হবে, সহজাত ফুটবলবোধটা ওর আছে, সেটা লেখা পড়লেই বোঝা যায়। ঈর্ষা করার মতো ওর একমুখিতা। ক্রিকেটকে ও খেলা বলেই গণ্য করে না। যা কিছু সব ফুটবল ঘিরে। লেখায় একটা চিন্তার খোরাক থাকে। সারা পৃথিবীতে ফুটবল কভার করেছে। দেশবিদেশের ফুটবল ওর নখদর্পণে। তৃতীয় নয়ন আছে। তাই চলতি হাওয়ার বিরুদ্ধে নতুন কিছু ভাবার, নতুন কিছু উপহার দেওয়ার ইচ্ছে ওর আজও। মাঠে বসে কিংবা টিভিতে দেখা ম্যাচটাও তাই আনন্দবাজারে পড়বার সময় মনে হয় টাটকা। আমারও এমন এমন ভুল বের করেছে যে, আমি নিজেই অবাক হয়ে গেছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মারাদোনাকে নিয়ে রূপকের এই বই, মারাদোনার ফুটবল এবং রূপকের লেখার মতোই জনপ্রিয় হবে।

৪ মে, ১৯৯৮ **প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

ডিয়েগো মারাদোনাকে প্রথম দেখি ইতালি বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হওয়ার তিন-চারদিন আগে। রোমের প্রেস-সেন্টারে বসে গল্প করছিলাম আমরা কয়েকজন। হঠাৎ আর্জেন্টিনার সাংবাদিক সের্জেই লেভেন্‌স্কি বলল, "বিলার্ডোর সঙ্গে আমরা কথা বলতে যাচ্ছি। তুমি কি যাবে ?"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আর্জেন্টিনা টিম ক্যাম্প করেছিল তেগোরিয়া বলে একটা জায়গায়। রোম শহর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে। সের্জেই বলল, "আমরা তিনজন মিলে একটা গাড়ি ভাড়া করেছি। তেগোরিয়া যেতে ঘণ্টাখানেক লাগবে। চলো, এখনই বেরিয়ে পড়ি। ওখানে গেলে ডিয়েগোর সঙ্গেও কথা বলা যাবে।"

কথাটা শোনামাত্রই সারা শরীর চনমন করে উঠল। মারাদোনাকে সামনাসামনি দেখা যাবে ? সেই ডিয়েগো মারাদোনা, যাঁকে নিয়ে সারা বিশ্ব উথালপাথাল ! চার বছর আগে মেক্সিকো বিশ্বকাপের সময় মারাদোনাকে টিভিতে দেখেছি। প্রেস-সেন্টারে বসে একটু আগে আমরা তাঁকে নিয়েই আলোচনা করছিলাম। সের্জেই অনেক গল্প বলছিল, ওর প্রিয় ডিয়েগো সম্পর্কে। ওর দাবি, পেলে কিছুই নন। সর্বকালের সেরা ফুটবলার ডিয়েগো মারাদোনা। এ-কথা শুনে রাগ করে আড্ডা ছেড়ে উঠে গিয়েছিল ব্রাজিলের এক সাংবাদিক।

প্রেস-সেন্টার থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম রেলা দু'টো নাগাদ। সের্জেই পরিচয় করিয়ে দিল আরও দু'জনের সঙ্গে। নাম মনে নেই। তাঁদের একজন বুয়েনস আইরেসের সবচেয়ে বড় কাগজ 'ক্লারিন'-এর ক্রীড়া-সম্পাদক। ওঁরা দু'জন ইংরেজি জানেন না। আর আমি স্প্যানিশে 'ওলা', 'কোমো এসতা উসতেড', 'এসতয় মুই বিয়েন' ছাড়া আর কিছু জানি না। মানে,

boiterpathshala.blogspot.com

'হ্যালো, কেমন আছ, আমি ভাল আছি' গোছের কিছু কথা।

সের্জেই ইংরেজি বলতে পারে। সেজন্যই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।

মারাদোনা সম্পর্কে আমাদের পাঠকদের অসীম কৌতূহল। তেগোরিয়ায় তাঁর সঙ্গে দেখা হলে চমৎকার একটা রিপোর্ট পাঠানো যাবে। ভাবতেই কেমন লাগছিল। হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। মাঝে প্রচণ্ড জ্যাম। বিরক্ত হয়ে উঠলাম। জীবনে আর কোনওদিন, কোনও ফুটবলারকে দেখার জন্য মনটা এমন উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেনি।

ইতালিতে পৌঁছেই অবশ্য টের পেয়েছিলাম, মারাদোনার নাম অথবা ছবি, কেমন ম্যাজিকের মতো কাজটা করে। রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বিমানবন্দরে নেমে সুটকেস নিয়ে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় যাব, বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমার দিকে একটা মেয়ে দৌড়ে এসে বলল, "চলো।"

পরনে নীল ব্লেজার। পকেটে বিশ্বকাপের প্রতীক। দেখেই বুঝলাম, বিশ্বকাপ সংগঠনের কেউ হবে। মেয়েটা অল্প দূরে একটা কাউন্টারে নিয়ে গেল। আমার দিকে কয়েকটা ফর্ম এগিয়ে দিল। নামধাম লিখে নিয়ে একটা কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা নিয়ে প্রেস-সেন্টারে চলে যেও। বাকি সব ব্যবস্থা ওরাই করে দেবে।"

দেখেশুনে আমি তো অবাক। মেয়েটা বুঝল কী করে, আমি বিশ্বকাপ ফুটবল কভার করতে গিয়েছি? কথাটা বলতেই ও উত্তর দিল, "চিনতে পারব না কেন? তোমার হাতে যে বইটা রয়েছে তার কভারে যে ডিয়েগোর ছবি আছে। তাই দেখেই বুঝলাম তুমি ফুটবলের লোক। টুরিস্ট নও।" এই কথাটা শুনে খেয়াল হল, সত্যিই তো, প্লেনে বসে যে বইটা পড়ছিলাম, তার মলাটে ডিয়েগো মারাদোনার ছবি আছে। বইটা আর ব্যাগে ভরার সময় পাইনি। নামার সময় হাতেই রয়ে গিয়েছে।

বললাম, "ডিয়েগোর খেলা তুমি দেখেছ?"

"কেন দেখব না? ও তো সেরি এ-তে খেলে। নাপোলি ক্লাবে। নাপোলি যখন রোমে খেলতে আসে, তখন দেখি।"

সেরি এ মানে প্রথম ডিভিশন লিগ। '৯০ সালে, সেই সময়

boierpathshala.blogspot.com

ইতালির ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভিয়ালি আর রোবার্তো বাজ্জো। কথার পিঠেই জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কাছে কে বেশি প্রিয়, ভিয়ালি না ডিয়েগো ?"

মেয়েটা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "কার সঙ্গে কার তুলনা করছ। অবশ্যই ডিয়েগো। ও আমাদের পোপের চেয়েও বেশি জনপ্রিয়।"

সেদিনই বুঝে গিয়েছিলাম, ইতালিয়ান না হলেও ডিয়েগো মারাদোনাকে ইতালির লোক কতটা ভালবাসে। আপনজন মনে করে। সের্জেইদের সঙ্গে গাড়িতে তেগোরিয়া যাওয়ার পথে এইসব ভাবছি, এমন সময় দেখি পাশের লেন দিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে কয়েকটা গাড়ি যাচ্ছে। নিশ্চয় কোনও ভি আই পি হবেন। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িগুলো দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। সের্জেই সেদিকে তাকিয়ে বলল, "কে গেলেন, জানো ? আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট। মেনেম। উনিও তেগোরিয়ায় যাচ্ছেন মারাদোনার সঙ্গে কথা বলতে। প্রথম ম্যাচ ক্যামেরুনের সঙ্গে। টিমকে জ্ঞান দিতে গেলেন।"

কথাটা আমাকে বলেই সের্জেই তাকাল ক্লারিন পত্রিকার সাংবাদিকের দিকে। দু'জন কী বলে হাসাহাসি করল। আমি কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছি দেখে সের্জেই বলল, "দেখো, আর্জেন্টিনা ঠিক হেরে যাবে ক্যামেরুনের কাছে।"

বললাম, "অসম্ভব। আর্জেন্টিনা গতবারের চ্যাম্পিয়ান। সেই টিম কী করে হারবে ? তার ওপর মারাদোনা আছে।"

সের্জেই বলল, "যে-ই থাক। প্রেসিডেন্ট মেনেম যে ম্যাচে মাঠে থাকে, সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনা জেতে না। লোকটা এমন অপয়া। দেশে তো মাঠে যেতে সাহস পায় না। এখানে চলে এসেছে।"

মনে মনে হাসছি। ফুটবল মাঠে কতরকম কুসংস্কার। সারা বিশ্বেই আছে। দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েও রেহাই নেই। মেনেম নিশ্চয়ই ফুটবলপ্রেমী। নাহলে এত কাজ ফেলে এত দূর আসবেন কেন ? সের্জেই সেই লোকটাকেও দুষছে। আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট এমন ফুটবলপ্রেমী হলে, আমরা তাঁকে মাথায় করে

boierpathshala.blogspot.com

রাখতাম।

টুকটাক কথা বলতে বলতে আমরা পৌঁছে গেলাম তেগোরিয়ায়। খুব ছোট্ট শহর। আমাদের কাঁচরাপাড়ার মতো জায়গা। রোমে এত বড় বড় হোটেল থাকা সত্ত্বেও, আর্জেন্টিনার মতো একটা চ্যাম্পিয়ান টিম, এখানে ক্যাম্প করল কেন, বুঝতে পারলাম না। পার্কিং প্লেসে গাড়ি রেখে, হেঁটে একটা বাঁক নিতেই চমকে গেলাম। বিরাট কাঁটাতারের বেড়া। গেটের সামনে মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে ২০-২২ জন গার্ড। প্রত্যেকের প্রেস কার্ড খুঁটিয়ে দেখে, তবে ওরা ভেতরে যেতে দিল।

সের্জেই বলল, "এই কমপ্লেক্সটা আসলে রোমা ক্লাবের। টিমটা এখানে প্র্যাকটিস করে। বিলার্ডোর ভাগ্য ভাল, এই জায়গাটা পেয়ে গেছে। এক বছর আগে এসে, সারা ইতালি চষে ফেলে ও এই কমপ্লেক্সটা পছন্দ করে। জানো, আর একদিন পরে এলে পেত না। জার্মান টিমটার নজর ছিল এই কমপ্লেক্সটার ওপর। ডিয়েগো ভাগ্যিস, খবরটা দিয়েছিল বিলার্ডোকে।"

সের্জেই এমনভাবে এই কথাগুলো বলল, যেন জার্মান টিমটাকে বিশ্বকাপের আগেই জব্দ করা গেছে। আসলে এই থাকার জায়গাটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা মনোমতো না হলে মুশকিল। বিশ্বকাপের সময় তা হলে পারফরম্যান্স ভাল হবে না। থাকা-খাওয়া যতই আমরা তুচ্ছ ব্যাপার মনে করি, তার একটা ভূমিকা থাকে পারফরম্যান্সে। যারা চ্যাম্পিয়ান হতে যায়, তারা এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার মাথায় রাখে।

যাই হোক, সের্জেইয়ের সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে কমপ্লেক্সের ভেতরে ঢুকতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। পরপর তিনটে মাঠ, সবুজ ঘাসে ভরা। একটা মাঠ ১০-১২ ফুট উঁচু কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। উলটো দিকে বাংলো টাইপের বাড়ি। সাদা রং দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। বাঁ পাশে ছোট্ট ইন্ডোর হল-কাম জিমনাশিয়াম। এ-সবই রোমা ক্লাবের সম্পত্তি। রোম শহরের দুটো ক্লাব সেরি এ-তে খেলে। এ এস রোমা আর লাজিও। এর মধ্যে রোমা-র রমরমা বেশি।

জিমনাশিয়ামের বাইরে খোলা চত্বরে দেশ-বিদেশের বহু

boierpathshala.blogspot.com

সাংবাদিক দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কারও কারও কাঁধে গদার মতো ক্যামেরা। সবাই একজনের অপেক্ষায়। ডিয়েগো মারাদোনা। বাংলোর ভেতর আছেন। এখনই বেরোবেন প্র্যাকটিস করার জন্য। প্রায় এক হাজার চোখ এবং শ'পাঁচেক লেন্স ওই বাংলোর দিকে তাক করা। মারাদোনার কোনও কিছুই যেন ফসকে না যায়।

মিনিট পনেরো পর আর্জেন্টিনা দলের ফুটবলাররা একে একে বেরোতে শুরু করলেন বাংলো থেকে। অনেক প্লেয়ারকে চিনি না। একজন বেরিয়ে আসছেন, আর তাঁকে ঘিরে সাংবাদিকদের ভিড়। দু-চারটে কথা বলে প্লেয়াররা চলে যাচ্ছেন কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা মাঠে। কোচ কার্লোস বিলার্ডো এলেন। ১৯৮৪ সালে কলকাতায় নেহরু কাপ ফুটবলে আর্জেন্টিনা টিমটাকে নিয়ে এসেছিলেন বিলার্ডো। তাই তাঁকে চিনতে পারলাম। বিলার্ডোও মিনিট পাঁচেক কথা বলে মাঠে ঢুকে গেলেন। কিন্তু মারাদোনা কই? তা হলে কি উনি প্র্যাকটিস করবেন না? আমরা বাইরে দাঁড়িয়েই রইলাম। ওদিকে, মাঠে পুরোদমে প্র্যাকটিস আরম্ভ হয়ে গেল।

দু'চোখ ভরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানদের প্র্যাকটিস দেখছি। মাঠের একদিকে নানারকম ব্যায়াম করছেন ফুটবলাররা। অন্য দিকটা ফাঁকা। হঠাৎ গুঞ্জন। তারপরই দেখলাম, সাংবাদিকরা দৌড়ে গেলেন বাংলোর দিকে। গেট দিয়ে বেরোচ্ছেন মারাদোনা। গায়ে সাদা-নীল জার্সি। সাদা শর্টস। সাংবাদিকদের হুড়মুড়িয়ে আসতে দেখে মারাদোনা থমকে দাঁড়িয়ে বিরক্ত মুখে একবার হাত তুলে থামতে বললেন। ব্যস, তাতেই কাজ হয়ে গেল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

মারাদোনা আমাদের পাশ দিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছেন। ফুটবল বুটে খটখট শব্দ হচ্ছে। ঊরুর পেশি নাচছে। উচ্চতা পাঁচ ফুট ছয়ের বেশি হতে পারে না। অন্যদের তুলনায় বেশ খাটোই বলা যায়। এরকম একটা ছোট্ট শরীরের ফুটবলারের এত তেজ! সারা ফুটবল বিশ্ব নাচিয়ে বেড়াচ্ছেন! চোখ-মুখ দেখে মনে হল, কৈশোর পেরোননি। এমন সারল্য। অথচ এই মানুষটাকে নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

এত বিতর্ক !

মারাদোনা মাঠে ঢুকে যেতেই ভিড়টা গিয়ে জমল কাঁটাতারের বেড়ার চারদিকে। অন্য প্লেয়ারদের নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই। মারাদোনা ডান দিকে যাচ্ছেন। বেড়ার বাইরে ভিড় ডান দিকে সরে যাচ্ছে। বাঁ দিকে গেলে ভিড় বাঁ দিকে। কখনও বিলার্ডোর সঙ্গে কথা বলছেন। কখনও সহ-ফুটবলারদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি মারছেন। বেড়ার বাইরে থেকে একজন ফোটোগ্রাফার চিৎকার করে বললেন, "ডিয়েগো, প্লিজ এদিকে একবার তাকাবে ?" মারাদোনা ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁকে দেখে মুখ ভ্যাংচালেন। তারপর হাসতে লাগলেন। ব্যস, ফোটোগ্রাফার তাতেই ধন্য। মুখ ভ্যাংচানো ওই ছবিটাই হয়তো তিনি বিক্রি করবেন লাখ-লাখ টাকায়।

সের্জেই কোথায় যেন ছিটকে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখি বলছে, "এই, তোমাকে এ খুঁজছে।"

সের্জেইয়ের পাশে আমাদেরই বয়সী একজন দাঁড়িয়ে। আমাকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কালকুত্তা থেকে এসেছ ?"

বললাম, "হ্যাঁ। কালকুত্তা নয়, ক্যালকাটা। কেন ?"

"১৯৮৪ সালে আর্জেন্টিনা টিমটার সঙ্গে কালকুত্তায় গিয়েছিলাম। আমি আর্জেন্টিনা ফুটবলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি আলেকজান্দ্রো ডোলিনা। তা, তোমাদের পালচাউধুরি কেমন আছে ?"

সের্জেই বলল, "এ ডিয়েগোর খুব বন্ধু। একসঙ্গে ফুটবল পলিটিক্স করে।" বলেই ও হাসতে শুরু করল।

মারাদোনার বন্ধু শুনে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ডোলিনা লোকটার ওপর। বললাম, "পালচৌধুরীর আসল নামটা কী বলতে পারবে ? কলকাতায় প্রচুর পালচৌধুরী আছে। ওটা পদবি।"

ডোলিনা বলল, "সেটা মনে নেই।"

সের্জেই আর ডোলিনা স্প্যানিশে কথা বলতে শুরু করল। ডোলিনা ঘাড় নাড়ছে আমার দিকে তাকিয়ে। তারপর আমাকে বলল, "আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য চেষ্টা করব।" বলেই ও

boierpathshala.blogspot.com

মাঠের দিকে চলে গেল।

কী ব্যাপার, জানতে চাইলে সের্জেই বলল, "আমি ওকে বললাম, যদি ও পারে, তা হলে তোমাকে পাঁচ মিনিটের জন্য বসিয়ে দিক ডিয়েগোর সঙ্গে। একেবারে আলাদা করে। ডোলিনা টিমের সঙ্গে এই কমপ্লেক্সেই রয়েছে। ডিয়েগো ওর কথা শোনে। কথা বলার সময় ও-ই তর্জমা করে দেবে।"

কথাটা শুনেই বুকটা দুরদুর করে উঠল। এত সৌভাগ্য কি আমার হবে ? পাঁচ মিনিট আমাদের মতো লোকদের কাছে কোনও সময় নয়। কিন্তু মারাদোনার কাছে এই সময়টাই অনেক। ইচ্ছে করলে কয়েক কোটি টাকা উনি রোজগার করতে পারেন ওই ৩০০ সেকেন্ডের মধ্যে। একটা জায়গায় বসে চট করে লিখে ফেললাম, কী কী প্রশ্ন করা যেতে পারে। তখনও জানি না, আমার জন্য কী বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে।

নোটবইয়ে লেখা শেষ করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ফোটোগ্রাফারদের দেখছি। বিশেষ করে জাপানি ফোটোগ্রাফারদের। মুভি ক্যামেরায় প্রাণভরে ছবি তুলছেন ওঁরা। মারাদোনা জাপানে বেশ পরিচিত। বিশ্ব যুব ফুটবল খেলেছিলেন ওখানে। চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল জাপানিদের সেই খেলা দেখে। জাপানিদের উৎসাহটা সেবার বেশি এই কারণে যে, ওঁরা তখন পেশাদার জে লিগ চালু করার জন্য তৈরি হচ্ছেন। তার আগে ফুটবলের সেরা প্লেয়ারকে দেখিয়ে খেলাটার সম্পর্কে যতটা আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়, তারই একটা চেষ্টা।

প্র্যাকটিসে মারাদোনা ব্যায়াম-ট্যায়ামের ধার দিয়েই গেলেন না। গোলকিপার নেরি পপিদুঁকে শিস দিয়ে তিনি ডেকে নিলেন মাঠের ফাঁকা অংশটাতে। তারপর শুটিং প্র্যাকটিস করতে থাকলেন। প্রায় ৪০ গজ থেকে বাঁ পায়ের সেই শট গোলার মতো ছুটে আসতে লাগল গোলপোস্টের দিকে। উফ, লোকটার পায়ের জোর দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যে বলটা বেড়ায় লাগছে, সেটা ছিটকে মাঝমাঠে চলে যাচ্ছে। আর তারের বেড়াটা ঝনঝন করে উঠছে।

হঠাৎ পপিদুঁর সঙ্গে কী একটা ব্যাপার নিয়ে তর্কাতর্কি হল

boierpathshala.blogspot.com

মারাদোনার। প্র্যাকটিস মাঠে ফুটবলারদের মধ্যে এসব হয়ই। কলকাতাতেও একবার মোহনবাগানের প্র্যাকটিসে দেখেছি সুভাষ ভৌমিক-সুব্রত ভট্টাচার্যের মধ্যে তর্কাতর্কি, হাতাহাতি। বড় প্লেয়ারদের ভীষণ 'ইগো'। পপিদুঁ আর মারাদোনার ঝগড়া দেখে তাই মজা লাগছিল। হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন মারাদোনা বলছেন, "তুই কোনও গোলকিপারই না। তোকে বলে বলে আমি গোল দেব।" পপিদুঁ তা মানবেন কেন?

এর পরই মারাদোনা মুখে দুটো আঙুল দিয়ে শিস দিলেন। উলটো দিকের পোস্টে প্র্যাকটিস করছিলেন টিমের দ্বিতীয় গোলকিপার গোয়কোচিয়া। তাঁকে আর ক্যানিজিয়াকে এদিকে ডেকে নিলেন। পপিদুঁ আর গোয়কোচিয়া— দু'জনকে মারাদোনা দাঁড় করালেন এদিককার গোলপোস্টে। উলটো দিকে, প্রায় ৩০ গজ দূরে দাঁড়িয়ে ক্যানিজিয়া। মারাদোনা তাঁকে বললেন, বল সেন্টার করতে। বেড়ার বাইরে গুঞ্জন থেমে গেল। একদিকে গোলপোস্টের নীচে বিশ্বের অন্যতম সেরা দুই গোলকিপার। অন্যদিকে সর্বকালের অন্যতম সেরা ফরওয়ার্ড। একটা অত্যাশ্চর্য লড়াই দেখার জন্য আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

আট বছর আগের কথা। তবুও চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে তেগোরিয়ায় মারাদোনার সেই শটগুলো। ক্যানিজিয়া সেন্টার করছেন। সেই বলে ভলি শট নিচ্ছেন মারাদোনা বাঁ পায়ে। বিদ্যুদ্বেগে বল ছুটে যাচ্ছে গোলপোস্টের দিকে। পপিদুঁ আর গোয়কোচিয়াকে ফাঁকি দিয়ে গোলে ঢুকছে। মারাদোনা কোমর দুলিয়ে নাচছেন বাচ্চা ছেলের মতো। একবার দুই গোলকিপারের মধ্যে মাথা ঠোকাঠুকিও হয়ে গেল। কোচ বিলার্ডো দৌড়ে এসে বকাবকি শুরু করলেন দুই গোলকিপারকে।

মারাদোনার ওই নিখুঁত ভলি শট দেখে আনন্দে চোখে জল এসে গেল। কার সঙ্গে তুলনা করব ওই শিল্পের? বিঠোফেনের সঙ্গীত, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির ছবি, ও হেনরির ছোটগল্প, না রদ্যাঁর ভাস্কর্য? সেদিন প্রথম দেখাতেই মনে হল, ডিয়েগো মারাদোনা নিছক একজন ফুটবলার নন, তার চেয়েও বড় কিছু। আর্জেন্টিনার লোকেরা তাঁর সঙ্গে তুলনা করেন গার্দেলের।

boiepathshala.blogspot.com

লাতিন আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, লোকসঙ্গীতস্রষ্টা গার্দেলের। কিন্তু সেই সঙ্গীতের মূর্ছনা অনুভব করার সুযোগ আমাদের হয়নি। ডিয়েগো মারাদোনার শিল্পকলা চোখের সামনে দেখলাম। দেখে ধন্য হয়ে গেলাম।

আধঘণ্টা পর মারাদোনা মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন জিমনাশিয়ামে। শ'পাঁচেক সাংবাদিক হুড়মুড় করে জিমে ঢুকতে গেলেন তাঁর সঙ্গে। না, কাউকেই ভেতরে যেতে দেওয়া হবে না। দরজার সামনে গার্ড। বাধা দিলেন আমাদের। একটু পরেই খবর এল, "মারাদোনা আজ শুধু কথা বলবেন তাঁর দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে। অন্যরা কেউ জিমের ভেতর ঢুকবেন না।" শুনে আমি দমে গেলাম। সের্জেইয়ের মুখের দিকে তাকাতেই ও বলল, "আমার সঙ্গে থাকো। কেউ আটকাবে না।"

বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্য দেশের সাংবাদিকরা। আর্জেন্টিনার তিন সাংবাদিকের মাঝে আমি ঢুকে গেলাম জিমের ভেতরে। ছোট্ট হলটা অন্ধকার। একধারে কাঠের প্ল্যাটফর্ম। তাতে একটা বাইসাইকেল আরগোমিটারের ওপর বসে মারাদোনা প্যাডল করছেন। ছাদ থেকে ঝুলছে একটা বাল্‌ব। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, মারাদোনা দরদর করে ঘামছেন। লোকটার এমনই শক্তি, শ'খানেক সাংবাদিক হলঘরে ঢুকেই চুপ করে গেলেন।

কারও দিকে না তাকিয়ে মারাদোনা প্যাডল করতেই থাকলেন। মাঝে-মাঝে শিস দিয়ে সুর ভাঁজছেন। অবাক চোখে তাকিয়ে আছি। হঠাৎ উনি বললেন, "কার কী প্রশ্ন আছে বলুন।" দশ-বারোজন একই সঙ্গে প্রশ্ন করে উঠলে মারাদোনা হাত তুলে সবাইকে থামিয়ে দিলেন। তারপর আরগোমিটার থেকে নেমে এসে, তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "আজ দীর্ঘদিন পর আমার দেশের প্রিয় সাংবাদিকদের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেলাম। আমার এমন কিছু কথা বলার আছে, যা অন্য সাংবাদিকদের সামনে বলা যায় না। বললে আমার প্রিয় আর্জেন্টিনার ক্ষতি হবে। আমরা এখানে...."

এই পর্যন্ত বলেই মারাদোনা হঠাৎ চুপ। তারপর ভিড়ের মাঝে

boierpathshala.blogspot.com

দাঁড়িয়ে থাকা একজনকে চিনতে পেরে বললেন, "এ কী, মাসিমো ? তুমি এখানে ? তোমাদের তো ডাকিনি। প্লিজ, তুমি যাও। তোমাদের জন্য কি আমি নিশ্চিন্তে, কিছু সময় আমার দেশের লোকেদের সঙ্গেও কথা বলতে পারব না ?"

ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা মাসিমো নামে সেই সাংবাদিকের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমার মতোই, আর্জেন্টিনীয়দের সঙ্গে ঢুকে পড়েছেন ইতালির গেজেত্তা দে লা স্পোর্টসের সেই সাংবাদিক। মুখ শুকনো করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মারাদোনা নাপোলি ক্লাবে খেলেন। তাই ইতালির সাংবাদিকদের সবার মুখ চেনেন। আমাকে চেনার কোনও প্রশ্নই নেই। তবুও সের্জেইয়ের গা ঘেঁষে আমি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রেস কার্ডে লেখা আছে ইন্ডিয়া। ধরা পড়লে বেইজ্জত হয়ে যাব।

প্রায় মিনিট কুড়ি কথা বলে গেলেন মারাদোনা। আর্জেন্টিনার সাংবাদিকরা দেখলাম, খুব খুশি। সবার চোখ-মুখে চাপা গর্ব। না, ডিয়েগো ইতালিতে আছে বটে, কিন্তু ইতালিয়ান হয়ে যায়নি। দেশই ওর কাছে বড়। দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাদা কথা বলে ও যে সম্মান দিল, তার জবাব নেই। সবাই তাই খুশি।

আলেকজান্দ্রো ডোলিনা কখন যে মারাদোনার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন, তা আগে লক্ষ করিনি। জিমনাশিয়াম থেকে বাংলোর দিকে যাওয়ার একটা দরজা আছে। সের্জেইকে ইঙ্গিতে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য উনি বললেন। অর্থাৎ প্রেস কনফারেন্স শেষ হলে মারাদোনা যখন বাংলোর দিকে যাবেন, তখন তাঁর সঙ্গে ডোলিনা আমাদের কথা বলিয়ে দেবেন। আমরা দু'জন আগেভাগেই দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে খোলা চত্বরটা দেখতে পাচ্ছি। অন্য দেশের সাংবাদিকরা সেখানে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন মারাদোনা। ডোলিনার সঙ্গে কথা বলছেন।

ডোলিনা বললেন, "তোমার ব্যবহারে ইতালিয়ান সাংবাদিকরা কষ্ট পেয়েছে।"

"তাই নাকি ? কিন্তু আমি তো কোনও অন্যায় করিনি।"

boierpathshala.blogspot.com

"সবার সামনে মাসিমোকে তুমি কড়া কথা না বললেই পারতে।"

"ইস, খুব ভুল হয়ে গেছে। তুমি ওকে ডেকে আনবে?"

আমাদের কথা ভুলে ডোলিনা তখনই ছুটলেন মাসিমোকে ধরে আনতে। আর তারপর মারাদোনা অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকে গেলেন বাংলোর ভেতরে। সের্জেই আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "হয়ে গেল। আর ডিয়েগোকে পাওয়া যাবে না। তোমার লাকটাই খারাপ।"

প্রথম দেখাতে, সেদিনই মারাদোনাকে চিনতে পারলাম। মনের কোনও স্থিরতা নেই। এই মুহূর্তে যা করছেন, পর মুহূর্তেই ভুলে যাচ্ছেন। কী করছেন, তা নিজেও জানেন না। এইজন্যই তাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক। এত সমস্যা। পেলে, বেকেনবাওয়ার, ববি মুর—এঁরাও এক-একজন মহান ফুটবলার। কিন্তু এঁরা বরাবর একটা পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি বজায় রেখেছেন। কেউ মারাদোনার মতো বিদ্রোহী ভাবমূর্তি গড়ে তোলেননি। কোনও দরকার ছিল না সেদিন, ইতালিয়ান সাংবাদিকদের চটানোর। অনাবশ্যক তিনি রাগালেন। স্বজাতিপ্রেম দেখাতে গিয়ে।

এই ভুলটার মাসুল তাঁকে দিতে হয়েছিল। বিশ্বকাপের পরে।

॥ ২ ॥

আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েনস আইরেসের কাগজ 'ক্লারিন'-এ একবার মারাদোনা বলেছিলেন, "জীবনে আমি অনেক ভুল করেছি। একটা ভুল করে হয়তো সারাদিন ধরে কেঁদেছি। কাঁদার পর সেই ভুলের কথাটা ভুলে গেছি। পরদিন আবার একটা ভুল করেছি।"

এরকম সরল স্বীকারোক্তি কি কখনও পেলে করতেন? অথবা ববি চার্লটন? কখনও না। মারাদোনা যেটাকে ভুল বলেছেন, অন্যরা সেটাকে ব্যাখ্যা করেছেন অন্যায়, আইন বহির্ভূত বলে। বারবার ড্রাগ কেলেঙ্কারিতে মারাদোনা জড়িয়ে পড়েছেন। ডোপ করার দায়ে অনেকবার সাসপেন্ড হয়েছেন। ক্লাব-কর্তাদের সঙ্গে

boierpathshala.blogspot.com

ঝামেলায় নিজের ক্ষতি করেছেন। এমনকী, ফিফার প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জকেও তিনি ছেড়ে দেননি। মারাদোনা সবসময় ক্ষমতাবান লোকেদের সঙ্গে লড়াই করে গেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, কোনও কোনও ক্ষেত্রে, তাঁর এই বিদ্রোহের দরকারও ছিল না।

আর্জেন্টিনার এল এক্সপ্রেসো কাগজে অস্কার রুগেরি একবার একটা মন্তব্য করেছিলেন মারাদোনা সম্পর্কে। মনে হয়, সেটাই সঠিক। "ছেলেবেলা থেকে ডিয়েগোকে অনেক কঠিন সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছে। সেই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে হয়েছে ওকে, নিজেকেই। সেজন্যই ও আজ মারাদোনা হতে পেরেছে। একটা সুপারম্যান ইমেজ গড়ে তুলেছে। আমরা ওর মতো সমস্যায় কখনও পড়িনি। সেজন্য নিজের ভেতর থেকে সেরা জিনিসটা কখনও বের করে আনতে পারিনি। প্রতিভাবান লোকদের কি কখনও আইন দিয়ে বেঁধে রাখা যায়? যায় না। তখনই প্রশ্ন উঠবে, কে এই আইনটা তৈরি করেছে? তার কী যোগ্যতা আছে? সে কি মারাদোনার মতো প্রতিভাবান?"

বিশ্বকাপার রুগেরি এই প্রশ্নটা তোলেন মারাদোনা ডোপ কেলেঙ্কারিতে শাস্তি পাওয়ার পর। আর্জেন্টিনার লোকেরা তখন এই কথাটাও বলেন, "যে ফুটবলার নিয়মিত কোকেন সেবন করেও এই স্তরের ফুটবল খেলতে পারে, সে তো পেলের চেয়েও বড়।"

গত ১৫ বছর মারাদোনা নিজে যত বিতর্কিত ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছেন, আর্জেন্টিনীয়রা তাঁকে নিয়ে তার দ্বিগুণ বিতর্কে জড়িয়েছেন। তাঁরা মানতেই চাননি, ডিয়েগো কোনও অবৈধ কাজ করতে পারেন। স্প্যানিশে একটা কথা আছে 'কমপ্লট'। এর মানে 'ষড়যন্ত্র'। যা কিছুই হোক না কেন, আর্জেন্টিনীয়রা তাতে কমপ্লটের গন্ধ পেয়েছেন। আমেরিকা বিশ্বকাপের সময় এটা বারবার লক্ষ করেছি।

অত বড় ডোপ কেলেঙ্কারিতে মারাদোনা সাসপেন্ড হলেন। বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনা ছিটকে গেল। তা সত্ত্বেও দেখলাম, কেউ মারাদোনাকে দোষারোপ করলেন না। আর্জেন্টিনার

boierpathshala.blogspot.com

সাংবাদিকরা, সবাই একবাক্যে বললেন, "এ তো আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আসলে কী জানেন, ফিফার প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ ব্রাজিলের লোক। উনি চান না, আমাদের দেশ বিশ্বকাপ জিতুক। তাই আগেভাগে চক্রান্ত করে, আমাদের হারিয়ে দিলেন।"

এই ধারণাটা লক্ষ করেছি, সের্জেইয়েরও। ডালাসে যেদিন মারাদোনাকে জানিয়ে দেওয়া হল, তিনি সাসপেন্ড, সেদিন সের্জেই আমার সামনে কেঁদে ফেলে বলেছিল, "আমি দেশে ফিরে যাব। কী হবে আর এখানে থেকে। যে বিশ্বকাপে মারাদোনা নেই, সেই বিশ্বকাপ নিয়ে আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।" সত্যি সত্যি, পরদিন ও লস অ্যাঞ্জেলিস হয়ে বুয়েনস আইরেস চলে গেল।

ব্রাজিলের সাংবাদিকরা অবশ্য এসব কথা শুনে হাসতেন। বলতেন, "মারাদোনার আসল জোরটা কী জানেন, ওকে আর্জেন্টিনার লোকেরা বড্ড বেশি বিশ্বাস করে। খুব বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলেছে। তাই ও অত খারাপ কাজ করেও পার পেয়ে যাচ্ছে। সবাই জানে, মারাদোনা কোকেন নেয়। শুধু নেয় বললে কম বলা হবে। কোকেনের জামা পরে থাকে। তবুও, লোকে চোখ বুজে রয়েছে। মারাদোনা মানেই ঝঞ্ঝাট, অশান্তি। অন্তত, আমাদের কাছে।"

মারাদোনা সম্পর্কে ওই সময় একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন বোকা জুনিয়র্স ক্লাবের এক ডাক্তার। নামটা এখন আর মনে নেই। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে। উনি যাবেন বস্টনে। আর আমি শিকাগো। বস্টনের ব্যবসন কলেজের ক্যাম্পাসে সেবার আর্জেন্টিনা টিম ক্যাম্প করেছিল। সেখান থেকে নানা শহরে খেলতে যাচ্ছিল। আগের দিন বালগারিয়ার কাছে আর্জেন্টিনা হেরে গেছে। সাসপেন্ড মারাদোনা সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি। মারাদোনার জিনিসপত্র সব পড়ে আছে ব্যবসন কলেজের সেই ডেরায়। বোকা জুনিয়র্সের ডাক্তার সেই লাগেজ আনতে যাচ্ছেন। লাগেজ নিয়ে তিনি চলে যাবেন বুয়েনস আইরেস।

মারাদোনাকে নিয়ে নানা কথা হচ্ছে সেদিন বিমানবন্দরে

boierpathshala.blogspot.com

বসে। সেই সময় ডাক্তার ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, "ডিয়েগোর আসল সমস্যাটা কী জানেন ? ওর মধ্যে আত্মবলি দেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। একটা দুঃখজনক ঘটনা ঢাকতে গিয়ে ও আরেকটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। এটা চক্রবৎ চলছে ওর জীবনে। ও হচ্ছে, উপন্যাসের ট্রাজিক হিরো।"

মারাদোনা একটা সময় বোকা জুনিয়র্সে খেলতেন। ওই ক্লাব থেকেই তিনি নজরে পড়েন ইউরোপের। ক্লাবের ডাক্তার তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। কথায় কথায় আরও বললেন, "ছোটবেলা থেকেই ও আত্মার ডাক পেত, বিশ্বের সবচেয়ে দামি ফুটবলার হবে। এই লক্ষ্যটা পূরণ করতে গিয়ে ও ওর ছেলেবেলাটাকে বলি দিয়েছে। ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে সবার নজর ওর ওপর। ও জানত, ওকে ঘিরে রয়েছে বিরাট একটা বাজার। ও একটা ব্যতিক্রম। এই কারণেই ওর মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতা গজায়। নিজের জীবনযাপনের ঢঙটাই ও বদলে ফেলে ব্যতিক্রম হতে গিয়ে। সুপারম্যান ইমেজ এনে ফেলে।"

ডাক্তারের কথাবার্তার মধ্যে প্রচণ্ড সহানুভূতি লক্ষ করি সেদিন নিউ ইয়র্ক বিমানবন্দরে। কিন্তু সবাই তো আর তাঁর মতো নন। মারাদোনা-বিরোধীও কিছু মানুষ আছেন। তাঁদের বক্তব্য, "মারাদোনা 'ব্লু ব্লাড' নন (অর্থাৎ অভিজাত সম্প্রদায়ের নন)। এমনকী 'গ্রিন ব্লাড'ও নন (অর্থাৎ এমন লোক নন, যাঁর প্রচুর টাকা, বনেদিয়ানার অভাব)। মারাদোনা হলেন রেড ব্লাড।" এই শেষ কথাটার মানে আগে বুঝিনি। পরে মারাদোনার পরিবারের উৎস খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি, রেড ব্লাড কথাটা আসলে কটাক্ষ করে বলা। বাবার দিক থেকে মারাদোনারা হলেন উপজাতি সম্প্রদায়ের। আর্জেন্টিনার গুয়ারানি উপজাতি।

মারাদোনার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ইতালি বিশ্বকাপের সময়। একদিন তেগোরিয়ায় প্র্যাকটিস দেখতে গিয়ে। মাঠে আর্জেন্টিনা দল অনুশীলন করছে। সেই সময় দেখি পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে আর কয়েকজনের সঙ্গে বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। একেবারে মারাদোনার মতো দেখতে। গায়ে হাফহাতা শার্ট। ঢোলা প্যান্ট। হাতে সিগারেট। গাঁট্টাগোট্টা শরীর। বয়স

boierpathshala.blogspot.com

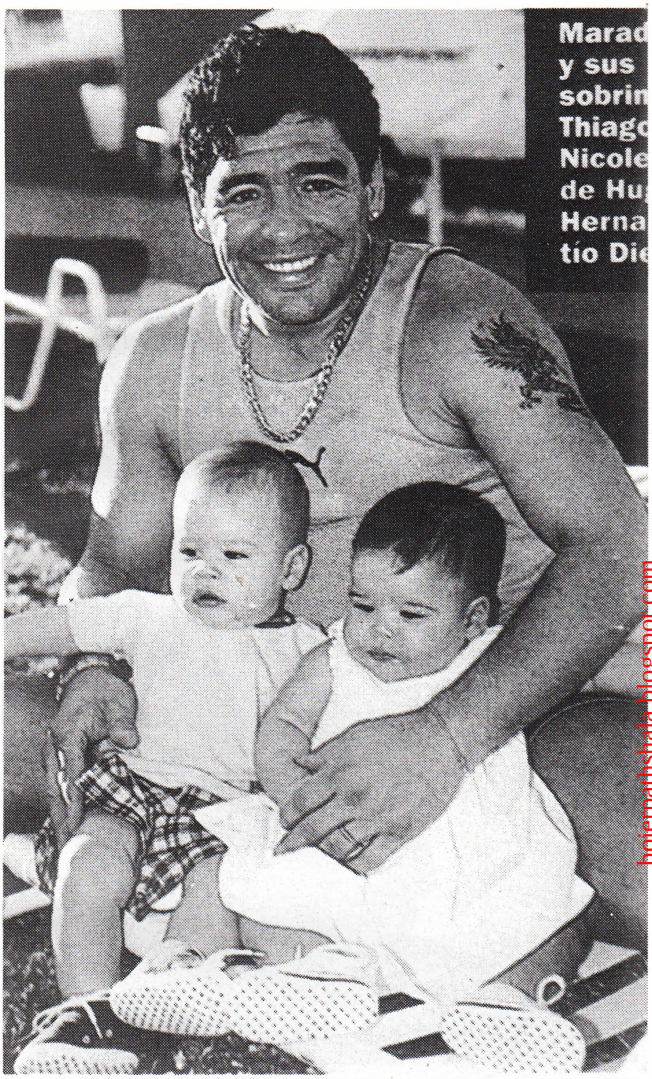

boierpathshala.blogspot.com

দুই মেয়ে ডালমা আর খিয়ানিনির সঙ্গে।

বোকা জুনিয়র্স স্টেডিয়ামে নিজের বক্সে।

boierpathshala.blogspot.com

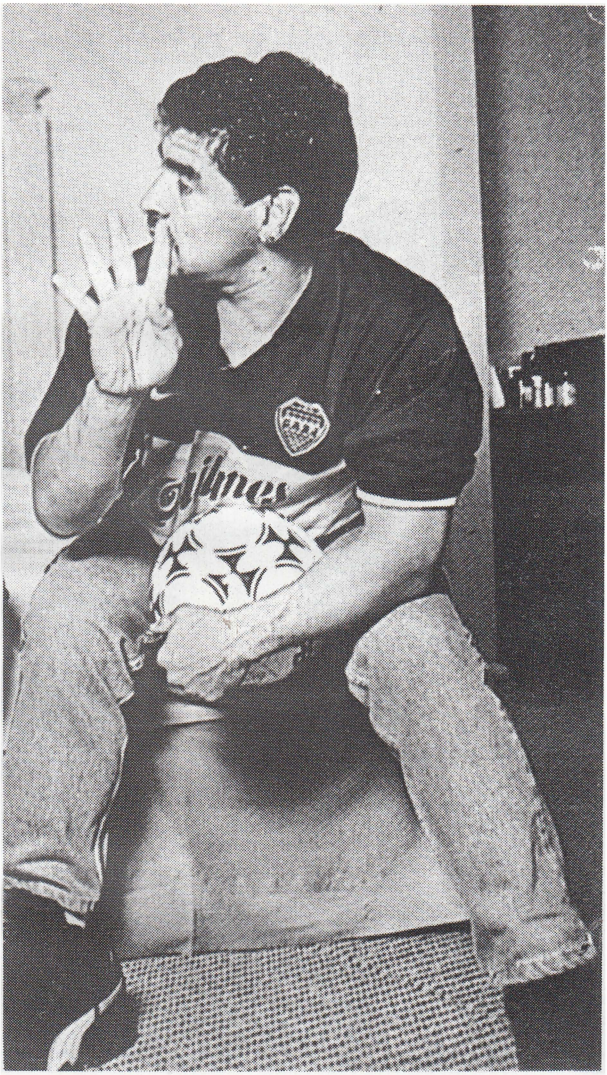

কোচের ভূমিকায়।

boierpathshala.blogspot.com

বাঁ পায়ে জাদু দেখানোর সময়।

boierpathshala.blogspot.com

সুইমিং পুলের দোলনায়।

boierpathshala.blogspot.com

বিষণ্ণতা যখন গ্রাস করে।

boierpathshala.blogspot.com

বোকা জুনিয়র্স কর্তার সঙ্গে।

boierpathshala.blogspot.com

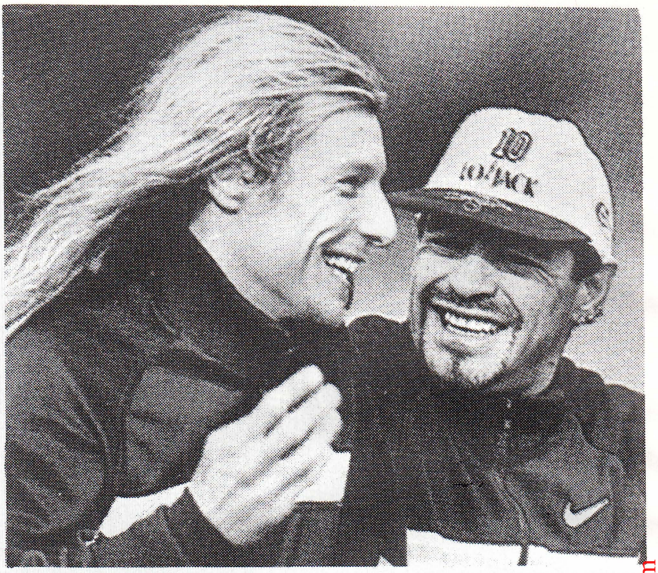

প্রিয় ফুটবলার ক্লাউদিও ক্যানিজিয়ার সঙ্গে।

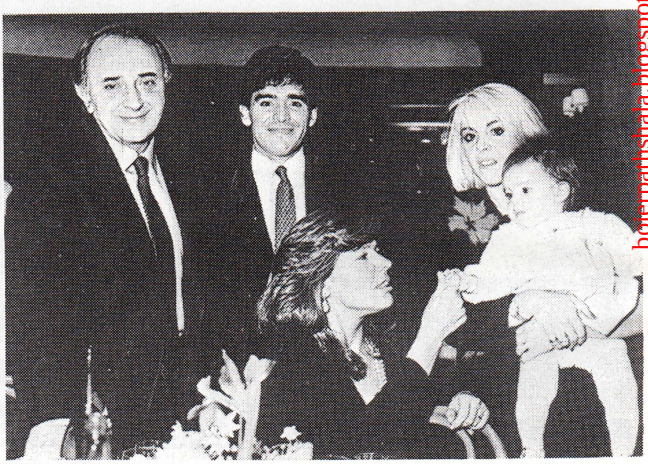

পারিবারিক পার্টিতে, বউ ক্লাউদিয়ার (ডানদিকে) সঙ্গে।

boierpathshala.blogspot.com

পঞ্চাশের কাছাকাছি। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম সের্জেইকে, "এই ভদ্রলোক কে বলো তো ?"

"মারাদোনার বাবা। এসো, তোমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিই।"

সের্জেই পাঁচিলের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতেই ভদ্রলোকের মুখে হাসি ফুটে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার নাম কী ?"

সের্জেই স্প্যানিশে তর্জমা করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই উনি বললেন, "ডিয়েগো মারাদোনা।"

ভাবলাম, বোধহয় উনি ঠাট্টা করছেন। বাবা আর ছেলের নাম কখনও এক হয় নাকি ? তা হলে যাঁকে আমরা ডিয়েগো বলে জানি, তাঁর নাম কী ? প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরোতেই বড় ডিয়েগো মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ওই যে ওকে দেখছ, ওর নাম আর্মান্দো মারাদোনা। পুরো নাম ডিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। আমার নাম ডন ডিয়েগো মারাদোনা। আমাদের রীতি অনুসারে বাবার নামটা প্রথমে বসাতে হয়। যেমন আমার বাবার নাম ছিল ডন। কিছু বুঝলে ?"

গলার স্বরটা ঘড়ঘড়ে। যাঁরা প্রচুর সিগারেট খান, তাঁদের এরকম হয়। আমার অজ্ঞতা দেখে উনি সের্জেইকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন। মনে হল, জানতে চাইলেন, এই লোকটা কে রে বাবা, কিচ্ছু জানে না। আমি সামান্য স্প্যানিশ জ্ঞান প্রয়োগ করলাম, "ইয়ো এস্তয় ভেনিয়েন্দো লা ইন্ডিয়া।" (আমি ভারত থেকে এসেছি)।

শুনে বড় ডিয়েগো যেন সন্তুষ্ট হলেন, "সি সি।"

বড় ডিয়েগোর ডাকনাম চিতোরো। এই নামটা ব্যবহার করাটাই বোধ হয় ঠিক হবে। নাহলে ফুটবলার ডিয়েগোর সঙ্গে গুলিয়ে যেতে পারে। ফুটবলার ডিয়েগোর সম্পর্কে লিখতে বসে মনে হচ্ছে জানানো দরকার, ওঁর পরিবারের উৎসটা ঠিক কোথায়। আর্জেন্টিনা ফুটবলের ঠিক কোন সময়ে মারাদোনা উঠে এলেন। সের্জেই একবার বলেছিল, "ডিয়েগো লোকটা কেমন জানো ? চে গুয়েভেরার মতো। যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জন্মেছে। ও (ডিয়েগো) এই লড়াইটা করেছে এমন

boierpathshala.blogspot.com

সময় যখন আর্জেন্টিনা ফুটবল কলেরায় আক্রান্ত হয়েছে।”

এই পরিস্থিতিটার কথা পরে বলা যাবে। আগে জানাই, চিতোরোর কথা। ওঁরা দীর্ঘদিনের বাসিন্দা আর্জেন্টিনার কোরিয়েন্তেস প্রদেশের এসকিনোয়। গুয়ারানি ইন্ডিয়ান উপজাতির মানুষ। চিতোরোদের বাড়িটা ছিল কোরিয়েন্তেস নদীর ধারে। একবারে গ্রাম্য পরিবেশে। সেখানে না ছিল বিদ্যুৎ, না আধুনিকতার ছাপ। লোকে জীবনযাপন করত মাছ ধরে আর শিকার করে। ভাগ্যবান যাঁরা, তাঁরা কৃষি শ্রমিক অথবা মালবাহকের কাজ পেতেন।

চিতোরো ছিলেন এই মুষ্টিমেয় ভাগ্যবানদের একজন। তিনি মালবাহকের কাজ জুটিয়েছিলেন এক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে। কোরিয়েন্তেস নদীর দক্ষিণ দিকে বুয়েনস আইরেস শহর। নদীপথেই ফল, ধান এবং অন্য কৃষিজ সামগ্রী এসকিনো থেকে যেত রাজধানীতে। চিতোরো খুব কায়িক পরিশ্রমী বলে সেই সময় সুনাম কুড়িয়েছিলেন। তাঁর কাঁধটা ষাঁড়ের মতো। প্রচুর মাল বইতে পারতেন। তাঁর ডাকনামটা ওই সময়ই চালু হয়। চিতোরো শব্দটার মানে বন্ধু এবং ষাঁড়—এই দুটোর সংমিশ্রণ। একবার বেশি মাল নিয়ে কায়দা দেখাতে গিয়ে চিতোরো মারাত্মক আহত হন। তাঁর পাঁজরের কয়েকটা হাড় ভেঙে যায়।

মারাদোনার মায়ের নাম তোতা। পুরো নাম দালমা সালভাদোরা ফ্রাঙ্কো। তোতা-দের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ইতালির লোক। তাঁরাও থাকতেন এসকিনোতে। সঠিক করে বলতে গেলে, চিতোরোদের বাড়ির দু'শো গজের মধ্যে। দুই পরিবারই চলত খুব কষ্টে। তোতার যখন আঠারো বছর বয়স, তখন চিতোরোর প্রতি আকৃষ্ট হন। সেই সময় চিতোরো খুব ভাল ফুটবল খেলতেন। তাঁর এক ভাই সিরিলোও সেই সময় নাম কিনেছিলেন ফুটবলার হিসেবে। এসকিনোতে লোকে পেট পুরে খেতে পেত না। কিন্তু ছুটির দিন বার্বিকিউ-র পরে চুটিয়ে ফুটবল খেলত। সিরিলোরা যে ক্লাবে খেলতেন, তার নাম সান মার্টিন ক্লাব। এই সিরিলোই মারাদোনাকে তাঁর জন্মদিনে প্রথম একটা ফুটবল উপহার দেন। তখন মারাদোনার বয়স মাত্র তিন বছর।

boierpathshala.blogspot.com

প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালাতে না পেরে তোতা একদিন সিদ্ধান্ত নেন, এসকিনোতে পড়ে থাকলে চলবে না। বুয়েনস আইরেসে যেতে হবে। ওখানে নতুন নতুন শিল্পস্থাপন হচ্ছে। একটা-না-একটা কাজ পাওয়া যাবেই। কিন্তু আপত্তি জানালেন চিতোরো। এসকিনোর মাঠ, নদী, পাহাড় ছেড়ে তিনি রাজধানীতে যাবেন না। মালবাহকের কাজ করে তিনি সামান্যই রোজগার করেন। বাকি সময় ছোট্ট নৌকোয় তিনি মাছ ধরে বেড়ান। শহরের ইট কাঠের জঙ্গলে গিয়ে তিনি মানাতে পারবেন না।

তোতা তাই একাই চলে গেলেন বুয়েনস আইরেসে। পরিচারিকার কাজ নিলেন এক ধনী পরিবারে। বড়দের জামা-কাপড় কাচা, বাচ্চাদের দেখভাল করার চাকরি। সেই সময় আর্জেন্টিনার সরকার সামরিক বাহিনীর লোকেদের হাতে। জেনারেল খুয়ান পেরো দেশের প্রেসিডেন্ট। জেনারেল পেরো ছিলেন ফুটবলপাগল মানুষ। তিনি একটা জিনিস বুঝেছিলেন, শাসনক্ষমতা যদি সামরিক বাহিনীর হাতে রাখতে হয়, তা হলে শ্রমিকশ্রেণীকে সঙ্গে নিতে হবে। সব ধরনের শ্রমিকের জন্যই তিনি একটা নির্দিষ্ট মজুরি ঠিক করে দিয়েছিলেন। এই কারণে তিনি খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। জেনারেল পেরো লক্ষ করেছিলেন, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ফুটবল খুব জনপ্রিয়। তাই ফুটবলে খুব উৎসাহ দেখাতেন। তোতা খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতেন জেনারেল পেরোকে। কেননা, পেরোর জন্যই তিনি পরিচারিকার কাজ করেও ভদ্রস্থ একটা মাইনে পাচ্ছিলেন।

দু'বছর পর দেশে ফিরে তোতা দেখলেন, চিতোরোর আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি জেদ ধরলেন, সবাইকে নিয়ে বুয়েনস আইরেসে যাবেন। চিতোরোর সেই নৌকো মাত্র সাড়ে তিন হাজার পেসোতে তিনি বিক্রি করে দিলেন। তারপর নদীপথেই এসে উঠলেন ভিসা ফিওরিতো বলে একটা জায়গায়। সেখানে খুব গরিব লোকেদের বাস। চিতোরো কয়েকদিনের মধ্যে ইট, কাঠের বোর্ড দিয়ে একটা চালাঘর বানিয়ে নিয়ে সেখানে থাকতে শুরু করলেন। তখন তাঁর তিন মেয়ে—

boierpathshala.blogspot.com

আয়লা, রিতা আর মারিয়া। মারাদোনার জন্ম তখনও হয়নি। ভিসা ফিওরিতোতে কয়েকদিন থাকার পরই চিতোরো বুঝতে পারলেন, কী মারাত্মক জায়গায় এসে পড়েছেন।

বুয়েনস আইরেসের শহরতলি। কিন্তু ফিওরিতোতে যত দু'নম্বর লোকের বাস। চোর-ডাকাত গুণ্ডাদের আড্ডা। ভাড়াটে খুনেদের লুকিয়ে থাকার জায়গা। বলা বাহুল্য, গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা চিতোরো ফিওরিতোতে হাঁফিয়ে উঠলেন। কিন্তু তোতা কঠিন মনের মানুষ। তিনি স্বামীর কথা প্রশ্রয় দিলেন না। নিজের মা সালভাদোরা কারিওলিচিকেও তিনি নিজের সংসারে নিয়ে এলেন। এসকিনো থেকে প্রথম বুয়েনস আইরেসে আসার পর থেকেই তোতা ওই শহরের প্রেমে পড়ে যান। আজীবন তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বের সেরা শহর বুয়েনস আইরেস। বহু পরে, একবার তিনি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বুয়েনস আইরেস হল বিশ্বের সেরা জায়গা, যদি প্রচুর অর্থ নিয়ে বসবাস করা যায়। আর বুয়েনস আইরেস হল বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ জায়গা, যদি কারও কাছে পয়সা না থাকে।"

ভিসা ফিওরিতোতে থাকার সময়ই চিতোরো একটা কাজ পেলেন ছোট কারখানায়। রোজ ভোর ছ'টার সময় যখন পরিবারের অন্যরা ঘুমিয়ে থাকতেন, তখন চিতোরো উঠে কারখানায় চলে যেতেন। যাওয়ার পথে একটা খাল পড়ত। আশপাশের কারখানার নোংরা আবর্জনা ওই খাল দিয়ে চলে যেত কোরিয়েন্তেস নদীতে। মারাদোনার বয়স যখন দু'বছর, তখন তিনি ওই খালে পড়ে গিয়ে প্রায় মরতে বসেছিলেন। কিন্তু কাকা সিরিলো দেখতে পেয়ে তাঁকে বাঁচান।

চিতোরো যে কারখানায় কাজ করতেন, সেখানে পশুর হাড় গুঁড়ো করা হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সেখানে। সেই সময়কার কথা উঠলে এখনও চিতোরো গুটিয়ে যান। জীবনধারণের জন্য যে সংগ্রাম তাঁকে একসময় করতে হয়েছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু চিতোরো ছিলেন খুব শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কারও কথায় তিনি প্রতিবাদ করতেন না। স্ত্রী তোতা ছিলেন পেরো-ভক্ত। কিন্তু চিতোরো পেরোকে সহ্য করতে পারতেন না। চিতোরোর ধারণা

boierpathshala.blogspot.com

ছিল, জেনারেল পেরোর জন্যই মালিকপক্ষ হাত গুটিয়ে নিয়েছে। বিনিয়োগ করছে না। দেশের অগ্রগতি থমকে আছে। কিন্তু রাজনীতির থেকেও চিতোরোর বেশি মনোযোগ তখন ফুটবলের দিকে। বুয়েনস আইরেস শহরটা তাঁর ক্রমেই ভাল লাগছিল ফুটবল পরিবেশের জন্য।

ঠিক ওই সময় ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর জন্ম হল মারাদোনার। দিনটা ছিল রবিবার। ফুটবল ম্যাচের দিন। আগের দিন চিতোরো তোতাকে ভর্তি করে এসেছিলেন পলিক্লিনিকো দে লা নুসে। ডান্স ফ্লোরে নাচতে গিয়েছিলেন দু'জন। তখনই তোতা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে। তোতার প্রথম তিন সন্তান মেয়ে। তিনি মনেপ্রাণে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, এবার যেন পুত্রসন্তান জন্মায়, যে ভবিষ্যতে সংসারের হাল ধরতে পারবে।

মারাদোনার জন্মানো নিয়ে আর্জেন্টিনায় একটা গল্প চালু আছে। কতটা সত্যি, জানি না। মারাদোনা যখন পৃথিবীর আলো দেখেন, তখন নাকি স্টেডিয়ামে খেলা চলছিল। হাসপাতালের কর্মীরা রেডিও ধারাবিবরণী শুনছিলেন। অপারেশন থিয়েটারে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষ মুহূর্তে নাকি তোতা বলে উঠেছিলেন, "গো-ও-ও-ও-ও-ও-ও-ল।" ধারাবিবরণী নাটকীয় করে তোলার জন্য আর্জেন্টিনার ভাষ্যকাররা গোল হলে নানাভাবে শব্দটাকে খেলান। অনেকটা সেইভাবে তোতা চিৎকার করে ওঠেন।

পলিক্লিনিকো দে লা নুসে সেদিন যে-ক'জন মা হন, সবাই কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। তোতাই একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। তাই হইচই পড়ে গিয়েছিল হাসপাতাল কর্মীদের মধ্যে। ডাক্তারদের কাছে এটা শুভ লক্ষণ। খুশিতে উপচে পড়ে ডাক্তার নাকি তোতাকে বলেন, "অভিনন্দন দোনিয়া। তোমার ছেলে বেশ গাঁট্টাগোট্টা হয়েছে। দেখো, একদিন সত্যিকারের পুরুষ হয়ে উঠবে।"

পুত্রসন্তানের কথা শুনে দোনিয়া তোতা আনন্দে কেঁদে ফেলেন। ঈশ্বর তাঁর কথা শুনেছেন।

boierpathshala.blogspot.com

॥ ৩ ॥

আর্জেন্টিনার মানুষ তিনটে জিনিস সারাজীবনে কখনও ভুলতে পারেন না। এক, তাঁর জন্মস্থান। দুই, তাঁর মাকে। তিন, তাঁর নিজের পরিবারকে। বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ফুটবলার হওয়ার পরও মারাদোনা কিন্তু এই তিনটে জিনিস কখনও ভোলেননি। ছেলেবেলায় ভিসা ফিওরিতোতে তাঁর বেশিরভাগ সময় কেটেছে আজামোর আর মারিওগ্রাভো বলে দুটো রাস্তার মোড়ে। অবশ্যই ফুটবল খেলে।

বহু বছর পরে একবার ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মারাদোনা স্মৃতিচারণ করেছিলেন তাঁর ছেলেবেলার। এই বলে যে, "দু' পায়ের ফাঁকে বল নিয়ে আমি জন্মেছি। নিজেকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই খেলে গেছি। ছেলেবেলায় চরম দারিদ্র্য আমার এই খিদেটা আরও বাড়িয়ে দেয়। আনন্দের মাত্রাটা বাড়ানোর জন্য আমি আরও ভাল খেলার চেষ্টা করেছি।"

ভিসা ফিওরিতোয় শিশুদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু ছিল না। পড়াশোনার কোনও বালাই নেই। বাবা-মায়েরা কেউ বলতেনও না। শিশুরা লোকাল ট্রেনে শহরে গিয়ে কয়েকটা পেসো রোজগারের ধান্দায় সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আসত। কেউ ভিক্ষে করত, কেউ রাস্তায় পড়ে থাকা সিগারেটের বাক্সের রাংতা সংগ্রহ করে সেগুলি বিক্রি করত। কেউ ট্যাক্সির দরজা খুলে দিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে পয়সা চাইত।

মারাদোনা কিন্তু অন্য শিশুদের মতো ছিলেন না। তাঁর ধ্যানজ্ঞান ফুটবল। সারাদিন বলই পিটিয়ে যেতেন। বাবা চিতোরো আর মা তোতা এক-এক সময় অবাক হতেন তাঁর স্কিল দেখে। একটা সময় সত্যিই তাঁদের বিশ্বাস জন্মাল, দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল, ছেলেকে ফুটবল খেলার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাওয়া। এই কারণে ছেলেকে স্কুলে পাঠানোর জন্য তাঁরা কোনও চাপই দিতেন না।

পুঁথিগত বিদ্যা না থাকার জন্য মারাদোনা অবশ্য জীবনে

boierpathshala.blogspot.com

কখনও আক্ষেপ করেননি। নাম করার পর তিনি যখন ফুটবল-কর্তাদের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন অনেকেই সমালোচনা করে বলেছিলেন, "শিক্ষার অভাবেই এই লোকটা বখে গেছে।" মারাদোনা তখন এল গ্রাফিকো কাগজে সাক্ষাৎকার দেন। তাতে বলেন, "না, এর জন্য শিক্ষার অভাব দায়ী নয়। দুঃখ হয়, যখন এই কথাটা শুনি। আমার বাবা-মা আমাকে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমাকে তখন ওঁরা ইংরেজি স্কুলে পাঠাবেন কোত্থেকে ? আমাদের তখন খাওয়ার সংস্থানই ছিল না। কী করে ওরা বলে, আমি ডিস্কো থেক-এ বড় হয়েছি। ড্রাগ ফিরি করে বড় হয়েছি ? এসব ওদের বানানো গপ্প। বলে ওরা মজা পায়। বিশ্বাস করুন, ছেলেবেলায় ড্রাগ কী বস্তু আমি তা জানতামই না। আমি তখন আমার মায়ের বড় ছেলে। এখনও আমি মায়ের ছেলে। মায়ের ছোট ছেলে।"

ছেলেবেলায় ভিসা ফিওরিতোর মতো অপরাধপ্রবণ একটা জায়গায় কাটানোর জন্য মারাদোনার মনে কোথাও এখনও একটা দুঃখ জমে আছে। তিনি জানেন, এখন যদি বলেন, অন্য শিশুদের মতো তিনি চুরি-চামারি বা ভিক্ষে করে বড় হননি, অনেকেই তা বিশ্বাস করবেন না। পরে যদি তিনি কোনও স্কুলে ভর্তিও হতেন, অন্য ছাত্ররা তা হলে তাঁকে ঘিরে ধরে জানতে চাইত, ড্রাগ বস্তুটা কী ? খেলে কী হয় বা কোথায় পাওয়া যায়।

এখনও মারাদোনা তাঁর ছেলেবেলা এবং বাবা-মা সম্পর্কে তাই প্রচণ্ড স্পর্শকাতর। তাঁর পরিবার সম্পর্কে বলতে গিয়ে একবার তিনি বলেছিলেন, "আমাদের পরিবারটা অত্যন্ত সাধারণ পরিবার। কিন্তু তা অসাধারণ হয়ে উঠেছে আমার জন্য। আমি যখন কিছু করেছি, তখন ভেবে করিনি, কাজটা ভাল না খারাপ। সুযোগ যখনই পেয়েছি, এগিয়ে গিয়েছি। বাবা-মা সব কিছু মেনে নিয়েছেন। এই কারণেই বাবা-মায়ের অবদান কখনও ভুলতে পারব না। যদি কোনও ভুল করে থাকি, তা হলে তা আমিই করেছি। বাবা-মায়ের কোনও দোষ নেই।"

বাবা-মায়ের প্রতি এই অন্ধ ভক্তি মারাদোনাকে অনেক উঁচুতে

boierpathshala.blogspot.com

তুলে ধরেছে। পরে নানা ঘটনায় সেটা বোঝা যাবে। তার আগে ফুটবলার হিসেবে তিনি কীভাবে নজরে পড়লেন, সেটা বলা যাক। মারাদোনাকে আবিষ্কার করেন ত্রোত্তা বলে একজন ট্রাক ড্রাইভার। ট্রাক নিয়ে তিনি নানা জায়গায় যেতেন। সময় পেলেই বাচ্চাদের ফুটবল দেখার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। বিনা কারণে নয়। বুয়েনস আইরেসে একটা ক্লাব আছে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স। তাদের ছোটদের টিমের নাম 'সেবোইতাস'। সেই দলের কোচ কর্নেখো আবার ত্রোত্তার বন্ধু ছিলেন। ত্রোত্তা করতেন কী, প্রতিভাবান কোনও ছেলের সন্ধান পেলেই খবর দিতেন কর্নেখোকে।

ত্রোত্তার এক পরিচিত ফ্রান্সিসকো কারিজো তখন থাকতেন ভিসা ফিওরিতোতে। একদিন কথায়-কথায় কারিজো তাঁকে বললেন, "আমাদের এখানে একটা ছেলে আছে, ডিয়েগিতো। দুর্দান্ত খেলে।"

ত্রোত্তা বললেন, "তাই না কি ? ছেলেটাকে দেখা যাবে ?"

"নিশ্চয়ই। আমার ছেলে গোয়ো-দের সঙ্গে ও খেলে।"

"চলুন। তা হলে দেখা যাক।"

দু'জনে মিলে মারাদোনার খেলা দেখতে গেলেন। খেলা দেখে ত্রোত্তা এমন মোহিত, পরের বার ফিওরিতোতে গিয়েই তিনি মারাদোনাকে তুলে নিলেন তাঁর ট্রাকে। সেবোইতাস ক্লাবে ট্রায়াল দিতে গিয়ে কিন্তু মারাদোনা পড়লেন ফ্যাসাদে। কর্নেখো তাঁর বল স্কিল দেখে কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না, বয়স মাত্র আট বছর। আসলে তখন মারাদোনার অপুষ্ট শরীর। তুলনায় মাথাটা বড়। ঝাঁকড়া চুল বলে মাথাটা আরও বড় দেখাত। কর্নেখোর ধারণা হয়েছিল, মারাদোনা বামন। বয়স অনেক বেশি। তিনি তখন আইডেন্টিটি কার্ড দেখতে চাইলেন। দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। না, বয়স তো ঠিকই আছে। সেইদিনই কর্নেখো মারাদোনাকে তাঁর টিমে নিয়ে নিলেন।

বুয়েনস আইরেসে ক্যাচো পালাদিনো বলে একজন ডাক্তার তখন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি স্টেরয়েড দিয়ে ফুটবলারদের শরীর তৈরি করে দিতেন।

boierpathshala.blogspot.com

এ-ব্যাপারে অবশ্য তাঁর খুব একটা সুনাম ছিল না। তবুও কর্নেখো একদিন তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন মারাদোনাকে। বললেন, "এই ছেলেটা একদিন আর্জেন্টিনা ফুটবল কাঁপিয়ে দেবে। একে আপনি একটু দেখুন।"

ডাঃ পালাদিনো 'চিকিৎসা' শুরু করলেন মারাদোনার। কেমন উন্নতি হচ্ছে, মাঠে তা দেখতে গিয়ে পালাদিনো তাজ্জব হয়ে গেলেন। খেলার শেষে কর্নেখোকে ডেকে তিনি বললেন, "খাঁটি হিরে তুমি পেয়ে গেছ। একে তুমি ছেড়ো না। অন্য কারও হাতে দিও না। একটু বড় হলে একে কোনও ক্লাবে বিক্রি করে দিও। তুমি বড়লোক হয়ে যাবে।"

কিন্তু হিরের ছটা কি কখনও চাপা থাকে? মারাদোনার নাম আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। আর্জেন্টিনার এক টিভি প্রযোজকের নজর ছিল ছোট্ট ডিয়েগোর ওপর। একদিন তাঁর চ্যানেলে কী একটা অনুষ্ঠান ছিল। কোনও কারণে সেটা বাতিল করতে হয়। ওই সময়টুকুতে টিভিতে কী দেখাবেন ভাবছেন। এমন সময় তাঁর মাথায় মারাদোনার কথা খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন সহকারীকে বললেন, "এখুনি ভিসা ফিওরিতোতে যাও। ডিয়েগোকে তুলে নিয়ে এসো। ও বল জাগলিং দেখাবে।"

মারাদোনাকে তুলে নিয়ে আসা হল। টিভি প্রযোজক তাঁর হাতে একটা বল, একটা কমলালেবু আর একটা বোতল তুলে দিলেন। তারপর ওই তিনটে জিনিস দিয়ে জাগলিং দেখাতে বললেন। মারাদোনা এসব ব্যাপারে খুব দক্ষ। টিভি ক্যামেরার সামনে তিনি বল নিয়ে তাঁর কন্ট্রোল দেখাতে লাগলেন। বাঁ পায়ে বল নাচাচ্ছেন তো নাচাচ্ছেনই। বল পা থেকে উরুতে, উরু থেকে কাঁধে, কাঁধ থেকে মাথায়। আবার কাঁধ, উরু থেকে পায়ে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর টিভি স্টেশনে ফোনের পর ফোন। কে এই ছোট্ট ছেলেটা? দর্শকদের দাবি, প্রতি শনিবার ছেলেটাকে টিভি পরদায় আনতে হবে। প্রযোজক তো ভীষণ খুশি। প্রতিশ্রুতি দিলেন, নিশ্চয়ই আনা হবে। সপ্তাহের পাঁচদিন

boierpathshala.blogspot.com

সেবোইতাস ক্লাবে কর্নেখোর কাছে প্র্যাকটিস। শনিবার টিভিতে বল জাগলিং দেখানো। এর সঙ্গে যোগ হল রবিবার, আর-একটা কাজ। সিনিয়ার দল আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবের ম্যাচে বিরতির সময় ওই বল স্কিল দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা।

আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের সমর্থকরা একটা সময় মারাদোনাকে এমন পছন্দ করতে শুরু করলেন যে, একেকদিন বড়দের ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, তাঁকে মাঠে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলতেন। এ নিয়ে একদিন অশান্তিও হয়ে গেল। সেদিন খেলা ছিল আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স দলের সঙ্গে বোকা জুনিয়র্সের। প্রথমার্ধে বিরক্তিকর খেলা দেখে মোটেই সন্তুষ্ট হননি দর্শকরা। বিরতির সময় তাঁদের মাতিয়ে দিলেন মারাদোনা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হবে। মারাদোনাকে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু দর্শকদের দাবি, মাঠ ছাড়া চলবে না। অগত্যা রেফারি অনুমতি দিলেন, ঠিক আছে, মাঠের বাইরে যেতে হবে না। রিজার্ভ বেঞ্চের পাশে মারাদোনাকে বসতে দেওয়া হবে।

পরদিন এই ঘটনাটা বুয়েনস আইরেসের সবচেয়ে বড় কাগজ ক্লারিনে বেরোল। তবে ভুল নাম দিয়ে। মারাদোনা নয়, বেরোল কারাদোনা। যে সাংবাদিক এই ভুলটা করেন, তিনি সারাজীবন আক্ষেপ করেছেন। এটা ১৯৭১ সালের ঘটনা। মারাদোনার বয়স তখন ১১ বছর।

ওই সময় কর্নেখোর ক্লাবে যোগ দেয় আন্দ্রিয়ান ডোমেনেচ বলে একটা ছেলে। বয়সে মারাদোনার চেয়ে এক বছর বড়। আর্জেন্টিনায় বিভিন্ন বয়স-ভিত্তিক টুর্নামেন্ট হয়। বয়স ভাঁড়িয়ে প্লেয়ার খেলানোর চল ও-দেশেও আছে। একবার লিগে সেবোইতাসের ম্যাচ বোকা জুনিয়র্সের ছোটদের টিমের সঙ্গে। প্রথমার্ধে টিম ০-৩ গোলে পিছিয়ে রয়েছে দেখে কর্নেখো ম্যাচ বাঁচানোর জন্য মারাদোনাকে নামিয়ে দিলেন ডোমেনেচদের সঙ্গে। টিমে একজন প্লেয়ার ছিল মন্তান্যা। তার নামে সই করে মারাদোনা মাঠে নামলেন। আর দ্বিতীয়ার্ধে পনেরো মিনিটের মধ্যে হ্যাটট্রিক করে ফেললেন।

এদিকে, টিমের একজন ভুলে গিয়েছিল মারাদোনা অন্যের নাম

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে খেলছেন। খেলার মাঝে সেই ছেলেটা বল পাওয়ার জন্য "ডিয়েগো, ডিয়েগো" বলে ডাকতে লাগল। ব্যস, মারাদোনা ধরা পড়ে গেলেন।

খেলা শেষ হওয়ার পর বোকা জুনিয়র্সের কোচ এসে কর্নেখোকে বললেন, "এই ছেলেটার নাম কি মন্তান্যা ? যদি তাই হয়, তা হলে আমার নাম মাও সে তুং।" ধরা পড়ে গিয়ে কর্নেখো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এসব ব্যাপারে খুব কড়া। বয়স আর নাম ভাঁড়ানোর জন্য ধরা পড়লে মারাদোনা সাসপেন্ড হবেন। তিনি অবশ্য কমবয়সীদের লিগে খেলেননি। তাঁর চেয়ে এক বছর বড়দের বিরুদ্ধে খেলেছেন। তাতে কিছু এসে-যায় না।

বোকা জুনিয়র্সের কোচ তখন হাসতে হাসতে বললেন, "এই ছেলেটার নামে আমি অবশ্য অভিযোগ করব না। কেননা, কোচ হিসেবে আমি চাই না, এ সাসপেন্ড হোক। এর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাক। কর্নেখো, তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, এই ভুল আর কখনও তুমি কোরো না।" এই কথা শুনে কর্নেখো হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

মারাদোনার জীবনের প্রথম কোচ কর্নেখো। তিনি নিজেও এক সময় ফুটবল খেলতেন। স্বপ্ন দেখতেন, নামী ফুটবলার হবেন। কিন্তু হাঁটুতে চোট লেগে যাওয়ার জন্য সেই স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। তাই বাচ্চাদের খেলা শেখানোর কাজে তিনি নেমে পড়েন। কাজ করতেন একটা ব্যাঙ্কে। ঝাড়ুদারের কাজ। কর্নেখো নিজেই ভালভাবে সংসার চালাতে পারতেন না। কিন্তু রোজ প্র্যাকটিসের পর তিনি সাধ্যমতো খাওয়াতেন মারাদোনাকে। তারপর এক-একদিন নিজেই পৌঁছে দিতে যেতেন ভিসা ফিওরিতোতে। চিতোরোর সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সাতটা বছর কর্নেখো লেগে ছিলেন মারাদোনার পেছনে।

মারাদোনার যখন ১৩ বছর বয়স, তখন কর্নেখোর সেবোইতাস টিম সারা আর্জেন্টিনা ইউথ কাপ চ্যাম্পিয়ান হয়। ফাইনাল ম্যাচে মারাদোনাকে দেখার পর আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবের কর্তারা

boiepathshala.blogspot.com

সিদ্ধান্ত নেন, এই ছেলেটাকে আর কর্নেখোর হাতে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। চিতোরোকে ডেকে মাসখানেক পর তাঁরা চুক্তি সেরে ফেলেন। কর্নেখো অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, ডিয়েগোকে অন্তত আরও একটা বছর তাঁর হাতে রাখা হোক। কিন্তু ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন, "আমাদের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। বাড়াবাড়ি কোরো না।" চোখের জল ফেলতে ফেলতে কর্নেখো ক্লাব ছেড়ে বেরোলেন। সাতটা বছর তিনি সময় দিলেন। বিনিময়ে কিছুই পেলেন না।

আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স প্রথম ডিভিশন লিগের টিম। তারা ভিসা দেল পার্কে একটা ফ্ল্যাট দিল মারাদোনাকে। বিরাট ফ্ল্যাট, যাতে পরিবারের সবাই মিলে থাকতে পারেন। চিতোরো হাড়ের কারখানার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলেন। ভিসা ফিওরিতোর সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলো শেষ হল। মাত্র ১৩ বছর বয়সেই সংসারের জোয়াল চাপল মারাদোনার কাঁধে। তিনিই একমাত্র রোজগেরে তখন। বড় ছেলের কর্তব্য করছেন। ডিয়েগোর সাফল্যে মা তোতা খুব বেশি। যাক, তবু ঈশ্বর মুখ তুলে তাকিয়েছেন। এবার থেকে ভদ্রস্থ জীবন যাপন করা যাবে।

ভিসা দেল পার্কে যাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই মারাদোনার সঙ্গে পরিচয় হয় ক্লাউদিয়া ভিলাফানে বলে একটা মেয়ের। সেটাও একটা অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে। সুপার মার্কেটে কিছু জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন তোতা। কাউন্টারে হিসেব করার পর দেখেন কিছু পয়সা কম পড়ছে। লাইনে তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্লাউদিয়া। ট্যাক্সি ড্রাইভারের মেয়ে। তিনি এগিয়ে এসে তোতাকে বলেন, "আমি আপনার বাড়ির কাছেই থাকি। আমার কাছে বাড়তি পেসো আছে। আপনি এখন নিন। পরে পাঠিয়ে দেবেন।" তোতা নাম-ঠিকানা লিখে নেন ক্লাউদিয়ার। বাড়ি ফিরেই বড় ছেলেকে পাঠান ক্লাউদিয়াদের বাড়িতে। সেইদিনই মারাদোনা আর ক্লাউদিয়ার মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তখন অবশ্য দু'জনের কেউই ভাবতে পারেননি, সম্পর্কটা সারাজীবনের জন্য হয়ে দাঁড়াবে।

ভিসা ফিওরিতোয় মারাদোনার বিশেষ বন্ধু কেউ ছিলেন না।

boierpathshala.blogspot.com

ভিসা দেল পার্কে বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এদের একজন রোদোন্দো আসেফেরো, এক সবজি বিক্রেতার ছেলে। আন্দ্রিয়ান ডোমেনেচ, যাঁর কথা আগে বলেছি। আরেকজন ইয়রগে সিস্টার্সপিলার। বয়সে মারাদোনার চেয়ে দু'বছরের বড়। ইহুদি পরিবারের ছেলে। এই পরিবারের সঙ্গে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল তখন। সিস্টার্সপিলারের বাবা ওই ক্লাবকে আর্থিক সাহায্য করতেন।

সিস্টার্সপিলার নিজে ছেলেবেলায় পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। তাই ফুটবলে প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও, নিজে খেলতে পারেননি। তাঁর বড় দাদা খুয়ান এডুয়ার্দো খেলতেন। কিন্তু একদিন খেলার সময় তাঁর তলপেটে মারাত্মক চোট লাগে। এডুয়ার্দো মারা যান। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে সিস্টার্সপিলার মাঠে যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন একজন এসে বললেন, "ডিয়েগো নামে একটা ছেলে তোমাদের ক্লাবে সই করেছে। ছেলেটা দুর্দান্ত খেলে। যাবে দেখতে?"

পরপর কয়েকদিন এই এক কথা শুনে সিস্টার্সপিলার একদিন গেলেন খেলা দেখতে। মারাদোনাকে এত ভাল লেগে গেল যে, তিনি বন্ধুত্ব পাতিয়ে একদিন বাড়িতে নিয়েও এলেন। ভিসা ফিওরিতোতে থাকার সময়ে মারাদোনা স্বপ্ন দেখতেন, খুব বড়লোক বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন। তিনি পেয়েও গেলেন বড়লোক বন্ধু। একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া, সিনেমা দেখা। সবই সিস্টার্সপিলারের পয়সায়। খেলায় মারাদোনা যত নাম করতে লাগলেন, ততই বন্ধুত্ব গভীর হতে থাকল সিস্টার্সপিলারের সঙ্গে। কাগজের লোকজন খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন মারাদোনার। সিস্টার্সপিলার সঙ্গে থাকতেন।

সিস্টার্সপিলার তখনও স্কুলের ছাত্র। কিন্তু পার্টটাইম চাকরি করতেন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবে। জন্মসূত্রে ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে হওয়ায় একটা ফুটবল ক্লাব চালানোর কৌশল তিনি ওই বয়সেই জেনে ফেলেন। ক্রমশই তাঁর মনে একটা ইচ্ছে জাগতে থাকে। ফুটবল-ব্যবসায় ঢুকবেন। মারাদোনার মতো ফুটবলার যাঁর বন্ধু, তাঁর অনেক সুবিধে। মারাদোনার মতো পণ্য

boierpathshala.blogspot.com

আর ক'জনের ভাগ্যে জোটে ? সেই সময় অর্থাৎ সাতের দশকের মাঝামাঝি আর্জেন্টিনায় ফুটবলারদের নিজস্ব এজেন্ট রাখার সিস্টেম ছিল না। সিস্টার্সপিলার ভাবলেন, ইউরোপে এই সিস্টেম আছে। সেটা কেন আর্জেন্টিনায় চালু করা যাবে না ? তিনি ঠিক করে নিলেন, মারাদোনার এজেন্ট হবেন।

চিতোরো আর তোতাও ওই সময় বুঝতে পারছিলেন, মারাদোনাকে নিয়ে বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর আগ্রহ বাড়ছে। নতুন এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। চেকের পর চেক আসছে। তাঁরা শুধু খরচ করতেই পারেন। কিন্তু আরও চেক আসতে পারে কীভাবে, তার হদিস তাঁদের অন্তত জানা নেই। ওই সময়ই বাইরের লোকজনদের তাঁরা অবিশ্বাস করতে লাগলেন। তোতার ধারণা হল, সবাই ঠকিয়ে নেওয়ার জন্য মুখিয়ে। একমাত্র সিস্টার্সপিলারই পারেন তাঁদের স্বার্থরক্ষা করতে। মারাদোনার সব ভার তাঁরা দিয়ে দিলেন সিস্টার্সপিলারের ওপর। সাত বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করেও কর্নেখো যা পাননি, সিস্টার্সপিলার তা পেয়ে গেলেন এক বছরের বন্ধুত্বের জোরে।

॥ ৪ ॥

মারাদোনার কথা লিখতে গিয়ে সিজার লুই মেনোত্তির কথা উল্লেখ করতেই হবে। মেনোত্তি আসলে রোজারিও প্রদেশের লোক। নিজে খেলেছেন আর্জেন্টিনার বিখ্যাত দুই ক্লাব—রেসিং আর বোকা জুনিয়র্সে। রোজারিও প্রদেশের লোকেরা রাজনীতি আর ফুটবল—দুটোতেই সমান উৎসাহী। দেশে সামরিক বাহিনীর সরকার। রোজারিওর লোকেরা একটু বাম-মনোভাবাপন্ন বলে পছন্দ করতেন না জেনারেল পেরোকে। মেনোত্তি নিজেও ছিলেন পেরোর কট্টর সমালোচক।

বুয়েনস আইরেসের ক্লাবগুলো সেই সময় কড়া ম্যান মার্কিং আর কিক অ্যান্ড রান স্টাইলে ফুটবল খেলত। কিন্তু মেনোত্তি একটু সৃষ্টিধর্মী স্টাইলের প্রবক্তা। যা দেখতে ভাল লাগে। খেলা ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুদিন মেনোত্তি সাংবাদিকতা করেন।

boierpathshala.blogspot.com

তারপর হুরাকান বলে একটা টিমের দায়িত্ব নেন। এই দলটা জাতীয় লিগ চ্যাম্পিয়ান হয় তিয়াত্তর সালে। যেদিন খেতাব জেতে, সেদিন তাদের সমর্থকরা স্টেডিয়ামে সরকারবিরোধী পোস্টার নিয়ে গিয়েছিলেন। এই কারণেই মেনোত্তি সারা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১৯৭৪-এর বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলের ভরাডুবি হল। তখনই দাবি উঠল, মেনোত্তিকে জাতীয় দলের কোচ করতে হবে। ঠিক সেই সময়ে মারাদোনার নাম ছড়িয়েছে 'বিস্ময় বালক' হিসেবে। জাতীয় কোচ হওয়ার আগে খবরের কাগজে খুব দার্শনিক কথাবার্তা বলছিলেন মেনোত্তি। আলফ্রেড ডি স্টেফানো, ওমার সিভোরির মতো কিংবদন্তি ফুটবলারদের দেশকে আবার সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দেশ হিসেবে তুলে ধরতে হবে। সৌম্যদর্শন মেনোত্তির লম্বা চুল, স্বপ্নালু চোখ দেখে লোকে বিশ্বাস করল, লোকটা যা বলছে—ঠিক বলছে।

উঠতি-তারকা মারাদোনার নাম মেনোত্তির কানে পৌঁছেছিল। জাতীয় কোচ নিযুক্ত হওয়ার পরই তিনি ঠিক করলেন, নিজে যাবেন। গিয়ে দেখবেন ছেলেটা কে? ১৯৭৬ সালের অক্টোবরে মারাদোনা যেদিন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হয়ে প্রথম খেলতে নামেন, সেইদিন মেনোত্তি গিয়ে হাজির হলেন স্টেডিয়ামে। খেলা টলারেসের বিরুদ্ধে। মেনোত্তি দেখলেন, গ্যালারি থেকে ঘন ঘন আওয়াজ উঠছে মা-রা-দো-না, মা-রা-দো-না। কিন্তু প্রথম ১১ জনের মধ্যে মারাদোনা নেই।

আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের কোচ তখন মন্তেস। প্রথমার্ধে টিম এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে দেখে, ক্রুদ্ধ দর্শকদের ঠাণ্ডা করতে মন্তেস নামালেন মারাদোনাকে। কিন্তু তাতে খেলার ফলের কোনও পরিবর্তন হল না। মারাদোনা বেশ ভাল খেললেন। অন্তত মেনোত্তির চোখে পড়ার মতো খেললেন। পরদিন থেকে কাগজগুলো বলতে শুরু করল, আটাত্তরে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। দলে মারাদোনাকে নিতেই হবে। এ নিয়ে আলোচনা চলতেই লাগল। এক দলের মতে, এত অল্প বয়সে মারাদোনাকে জাতীয় দলে নেওয়া উচিত নয়। অন্য দলের বক্তব্য,

boierpathshala.blogspot.com

প্রতিভাবানদের কাছে বয়স কিছুই না।

সাতাত্তর সালে মেনোত্তি সত্যিই ডাকলেন মারাদোনাকে। হাঙ্গারির সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ। বোকা জুনিয়র্সের বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে। ম্যাচের দু-তিনদিন আগে আলাদা ডেকে মেনোত্তি মারাদোনার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। এমনও বললেন, হাঙ্গারি ম্যাচে তাঁকে নামাতেও পারেন। তবে এ-কথা কাউকে বলা যাবে না। খবরের কাগজ আর টিভি ক্যামেরা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। মনটাকে শান্ত রাখতে হবে। এই একটা সুযোগ তিনি দিচ্ছেন, যা লোকে শত চেষ্টা করেও পায় না।

মেনোত্তিকে তখন ভগবান বলে মেনে নিয়েছেন মারাদোনা। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললেন তাঁর কথা। রবিবার দুপুর পর্যন্ত হোটেলের ঘর ছেড়ে বেরোলেন না। বিকেলে টিমের সঙ্গে চললেন বোম্বোনেরা স্টেডিয়ামে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে সিস্টার্সপিলার খেলা দেখতে গেছেন। এই প্রথম মাঠে ঢোকার আগে মারাদোনা একটু নার্ভাস হয়ে গেলেন। টিমে মারিও কেম্পেস, লুকে, বার্তোনি, বোচিনি, আর্দিলেসের মতো প্লেয়ার। তাঁদের সঙ্গে খেলবেন। ১৭ বছর বয়সী একটা ছেলের পক্ষে এটা বিরাট ব্যাপার।

মেনোত্তি অবশ্য প্রথম একাদশে তাঁকে রাখলেন না। প্রথমার্ধেই আর্জেন্টিনা ৪-০ গোলে এগিয়ে গেল। দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি মেনোত্তি নামালেন মারাদোনাকে। অতি অল্প সময়ের জন্য। দর্শকরা তাতেই খুশি। জাতীয় দলের কোচিং ক্যাম্পে ডাক পেলেন মারাদোনা। মন দিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। এই দিনটার জন্যই তিনি অপেক্ষা করছিলেন। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ খেলার। ভিসা ফিওরিতোর চালাঘরে শুয়ে তিনি স্বপ্ন দেখতেন বোচিনির মতো ফুটবলার হবেন। ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টের নামী ফুটবলার বোচিনির মতো। প্রায় রবিবার তিনি ছুটে যেতেন ইন্ডিপেন্ডিয়েন্টের স্টেডিয়ামে। সেই স্বপ্ন সফল হওয়ার সময় বুঝি এসে গেল।

কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেক তফাত। মেনোত্তি তাঁর

boierpathshala.blogspot.com

২২ জনের দলে মারাদোনাকে রাখলেন না। খবরটা যখন ভিসা দেল পার্কে পৌঁছল, মারাদোনা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন। খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, বাদ পড়তে পারেন। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে রিভারপ্লেট ক্লাবের আলোনসোকে। যিনি নখের যোগ্য না। চিতোরো আর সিস্টার্সপিলার অনেক সাধ্যসাধনা করে ঘরের দরজা খোলালেন। অনেক বুঝিয়ে মারাদোনাকে খাওয়ালেন। সারা দেশে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেল। মারাদোনাকে বাদ দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

মেনোত্তি অবশ্য সমালোচনা শোনার লোক নন। এক কান দিয়ে শুনলেন, অন্য কান দিয়ে তা বের করে দিলেন। তাঁর এক কথা, মাত্র ১৭ বছর বয়সী একটা ছেলেকে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া উচিত হবে না। এতে মারাদোনারই ক্ষতি হবে। যদি কোনও কারণে টিম হারে, সেই ধাক্কা বাচ্চা ছেলে সামলাতে পারবে না। প্রীতি ম্যাচ খেলা এক জিনিস। আর বিশ্বকাপ খেলা অন্য। অনেক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। কেন তা হলে আলোনসোকে নিলেন? মেনোত্তি বললেন, "বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচটা হবে রিভারপ্লেটের স্টেডিয়ামে। আলোনসো ওই ক্লাবের প্লেয়ার। দর্শকরা সমর্থন বেশি করবে তাকে।"

সমালোচকরা অবশ্য অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তাঁদের মতে, মারাদোনার জনপ্রিয়তা মেনোত্তি আন্দাজ করেছিলেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন চ্যাম্পিয়ান হবেন। এবং একা ভোগ করবেন সেই কৃতিত্ব। তিনি চাননি, মারাদোনার মতো কেউ তাঁর কৃতিত্বে ভাগ বসাক। তিনি বুঝে যান, মারাদোনাকে দলে রাখলে, দুর্দান্ত খেলে জনপ্রিয়তার সবটুকুই ছেলেটা দখল করে নেবে। আবার অনেকে, মারাদোনার বাদ পড়ার পেছনে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের কর্তাদের কালো হাত দেখতে পেয়েছেন। জাতীয় দলের ক্যাম্প যখন চলছে, তখন ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি শেষ হয়ে যায় মারাদোনার। আর্জেন্টিনোস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সেত্তিমিও আলোইসিও দেখলেন, মারাদোনা যদি বিশ্বকাপে হইচই ফেলে দেন, তা হলে তিনি ফিরে আসার পর মারাত্মক দাম হেঁকে

boierpathshala.blogspot.com

বসবেন। সেই অর্থ দেওয়ার সামর্থ্য ক্লাবের থাকবে না। তার থেকে চূড়ান্ত দলে সুযোগ না পাওয়াই ভাল। তা হলে মারাদোনাকে বেশ কয়েক বছরের জন্য তিনি বেঁধে ফেলতে পারবেন। পরে দরকারমতো বিক্রি করে দেবেন অন্য কোনও ক্লাবে।

এত সব রাজনীতি বোঝার বয়স তখন মারাদোনার হয়নি। ঘরের মাটিতে বিশ্বকাপ চলার সময় তিনি দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। আর মনে মনে ঠিক করলেন, জীবনে কখনও মেনোত্তিকে তিনি ক্ষমা করবেন না। কিন্তু মেনোত্তির তখন সুসময় চলছে। আটাত্তরে বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হল আর্জেন্টিনা। সাময়িকভাবে মারাদোনার কথা লোকে ভুলে গেল। সারা দেশ মারিও কেম্পেস আর লুকে-কে নিয়ে আনন্দে মত্ত। অনেক পরে আবিষ্কার হয়েছিল, মেনোত্তি পুরো দলটাকে রোজ ডোপ করে নামাতেন। আর ডোপ পরীক্ষার জন্য যে প্রস্রাব পাঠানো হত, তা টিমের জলবাহকের স্ত্রীর। এসব অবশ্য ধরা পড়ল না। মেনোত্তি জাতীয় নায়ক হয়ে গেলেন। চার বছর পর মারাদোনা সুদে-আসলে শোধ তোলেন। ইতালি বিশ্বকাপে মেনোত্তিকে ডুবিয়ে দিয়ে। মারাদোনা তখন বিদ্রোহী। আর্জেন্টিনার ফুটবল সিস্টেমের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন। কিসে নিজের ফয়দা হয়, তা বুঝতে শিখেছেন। তাঁর প্রতি পূর্ণ সমর্থন নিয়ে এগিয়ে এল একটা সংস্থা। বারাস ব্রাভাস।

এই বারাস ব্রাভাস দলটা সম্পর্কে অনেক লোমহর্ষক গল্প আমি নিজেও শুনেছি সের্জেই লেভেনস্কির কাছে। এই দলটার নেতা হলেন 'গড ফাদার'। আসল নাম তাঁর কী, কেউ জানে না। কিন্তু এই গড ফাদারের অঙ্গুলিহেলনে আর্জেন্টিনার ফুটবল স্টেডিয়ামে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। এরাই গ্যালারির দর্শকদের নিয়ন্ত্রণ করে। ক্লাবের ফ্যান ক্লাব নয়। এরা পরিচিত গুণ্ডামি আর মারপিট করার জন্য। সের্জেইয়ের মুখে শুনেছি, এই বারাস ব্রাভাস এত শক্তিশালী, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বা ডিরেক্টররা এদের প্রচণ্ড ভয় পান। পুলিশও এদের সমীহ করে চলে।

এই বারাস ব্রাভাস-এর এত বাড়বাড়ন্তের পেছনে, শোনা যায়,

boierpathshala.blogspot.com

সামরিক সরকারের নাকি প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। সামরিক বাহিনীর কর্তারা সরাসরি সরকারে থেকে ফুটবলের ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। তা হলে জনসাধারণের মধ্যে একটা অন্য প্রতিক্রিয়া হত। সেই কারণে একেক কর্তা একেকটা ক্লাবের দখল নিতেন এই বারাস ব্রাভাসের সাহায্য নিয়ে। তাঁরাই পেছন থেকে অর্থ জোগাতেন। পুলিশ ধরলে ছাড়িয়ে দিতেন।

১৯৭৯ সালে বিশ্ব যুব ফুটবলের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের চূড়ান্ত ম্যাচে আর্জেন্টিনা যেদিন পেরুকে ৪-০ গোলে হারাল, সেদিন ফুটবলপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস দেখে সামরিক বাহিনীর কর্তারা বুঝে গেলেন, কেম্পেস-লুকেদের দিন শেষ। একজন ফুটবলারই সারা দেশকে নাচাবেন। তিনি মারাদোনা। একটা সময় আসবে, যখন মারাদোনার কথায় দেশের লোক উঠবে-বসবে। আর্জেন্টিনার ফুটবলকে যাঁরা ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন না, সেই ব্রাজিলের সাংবাদিকরাও পেরুর বিরুদ্ধে মারাদোনার খেলা দেখে লিখতে বাধ্য হয়েছেন, "পেলের পর এত বড় মাপের ফুটবলার বিশ্বে আর আসেনি।"

সামরিক বাহিনীর লোকেদের সঙ্গে সরাসরি যে ক্লাবের যোগাযোগ ছিল, সেটা মারাদোনার নিজেরই ক্লাব আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স। ওই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট প্রসপেরো কনসোলি একটা সময় নিজেই চাকরি করতেন সামরিক বাহিনীতে। মারাদোনার সঙ্গে চুক্তি করার ভার তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেত্তিমিও আলোইসিওর ওপর না রেখে, নিজেই নেমে পড়লেন। এ-ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন জেনারেল গুইলার্মো সুয়ারেজ মাসন। প্রায়ই হেলিকপ্টারে করে জেনারেল মাসন আসতেন ক্লাবে। মারাদোনার ব্যাপারে কথা বলতে।

মারাদোনা তখন বিশ্ব যুব ফুটবল খেলতে গেছেন টোকিয়োতে। একের পর এক ম্যাচ জিতছেন। তাঁর সঙ্গে জাপানে গেছেন সিস্টার্সপিলার আর চিতোরো। টোকিয়োতে ফাইনাল ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। আর বুয়েনস আইরেসে উৎসবের প্রস্তুতি চালাচ্ছেন জেনারেল মাসন। সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে যেসব কাগজ আর টিভি চ্যানেল ছিল, তার রিপোর্টাররা

boierpathshala.blogspot.com

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রয়েছেন তোতা আর ক্লাউদিয়ার কাছে। তাঁদের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। টিভি-র পরদায় দেখাচ্ছেন, তোতা হেয়ার ড্রেসারের সামনে বসে বলে যাচ্ছেন ছেলের কথা। হবু স্ত্রী ক্লাউদিয়া লাজুক মুখে বলছেন, ডিয়েগো রোজ ফোন করছেন তাঁকে টোকিয়ো থেকে।

তোতা সেই সময় এক সাক্ষাৎকারে একটা ঘটনার কথা শুনিয়েছিলেন দর্শকদের। মারাদোনার এক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। জীবনে প্রথম দেশের বাইরে, উরুগুয়েতে খেলতে গেছেন মারাদোনা আর্জেন্টিনার ১৪ বছর বয়সী টিমের সঙ্গে। কয়েকটা প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে হবে সেখানে। উরুগুয়ের সংগঠকরা হোটেল খরচ বাঁচানোর জন্য আর্জেন্টিনার এক-একজন প্লেয়ারকে একেকটি পরিবারের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করেন। অন্য সব প্লেয়ারকে ভাল ভাল পরিবারে রাখা হয়। কিন্তু মারাদোনা ভিসা ফিওরিতোর ছেলে। তাঁকে থাকতে দেওয়া হয় একজন বেকার নিগ্রো যুবকের ঘরে। মারাদোনা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন এই অবহেলায়। বাড়ি ফিরে তোতাকে প্রশ্ন করেন, "মা, ওরা আমাকে এত তাচ্ছিল্য করল কেন?" টিভি-তে এই ঘটনাটি তোতা বলার পরই সারা আর্জেন্টিনায় ধিক্কারের বন্যা বয়ে যায় ফুটবল-কর্তাদের বিরুদ্ধে। এই সুযোগটাই নেন সামরিক বাহিনীর কর্তারা। মারাদোনার জন্য লাল কার্পেট বিছিয়ে। এইভাবে তাঁরা বোঝাতে চাইলেন, তাঁরা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গেই আছেন।

টোকিয়ো থেকে বিশ্ব যুব কাপ জিতে মারাদোনা দেশে ফিরে এলেন।

জেনারেল মাসন আর দেরি করলেন না। সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি দেখাশোনা করতেন দেশের একমাত্র পেট্রোল উৎপাদন সংস্থা ওয়াই পি এফ আর বিমান সংস্থা উস্ত্রালের। ওই দুই জায়গা থেকে আড়াই লাখ পাউন্ড সরিয়ে তিনি মারাদোনাকে সই করালেন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সে। এটা করার সময় তিনি একটু চালাকিরও আশ্রয় নিলেন। ওয়াই পি এফ-এর টুপি আর উস্ত্রালের টি-শার্ট পরিয়ে মারাদোনাকে তিনি নিয়ে এলেন সই করার অনুষ্ঠানে। দেখালেন, দুই কোম্পানি বিজ্ঞাপন হিসেবে

boierpathshala.blogspot.com

ব্যবহার করবে মারাদোনাকে। বুয়েনস আইরেসের কোনও সাংবাদিক ভয়ে একটা কথাও লিখলেন না। লিখলে বারাস ব্রাভাস-এর কোপে পড়বেন বলে। সেদিন সই করার অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন এক ফরাসি সাংবাদিক। কী করে সরকারি কোষাগারের টাকা একজন ফুটবলারকে দেওয়া হল জিজ্ঞেস করায়, তাঁকে তুলে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ঠিক এই পর্যায়ে, সামরিক বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেল। জেনারেল মাসন পদাতিক বাহিনীর লোক। তিনি আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের হাতে মারাদোনাকে তুলে দিলেন দেখে, নৌবাহিনীর এক অ্যাডমিরাল কার্লোস লাকস্তে উঠেপড়ে লাগলেন মারাদোনাকে রিভারপ্লেট ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অ্যাডমিরাল লাকস্তে ছিলেন রিভারপ্লেটের বোর্ড মেম্বার। কিন্তু ওই ক্লাবে তখন ড্যানিয়েল পাসারেল্লার রাজত্ব। আটাত্তরের বিশ্বকাপজয়ী টিমের অধিনায়ক। পাসারেল্লা কিছুতেই মারাদোনাকে সহ্য করতে পারতেন না। কেননা, আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয় নিয়ে মারাদোনা প্রকাশ্যে কটাক্ষ করেছিলেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে পেরুকে সেই ৬-০ গোলে হারানো নিয়ে বিদ্রূপ। ওই ম্যাচ অত গোলে না জিতলে আর্জেন্টিনা ফাইনালে পৌঁছতেই পারত না। সারা বিশ্ব সন্দেহ করেছিল, ম্যাচটা গট আপ হয়েছে।

রিভারপ্লেট ক্লাবে পাসারেল্লার তখন এমন দাপট, ক্লাব-কর্তারা মারাদোনাকে নেওয়ার জন্য তেমন চেষ্টাই করলেন না। তাঁরা জানতেন, পাসারেল্লা যতদিন ক্লাবে থাকবেন, ততদিন মারাদোনাকে ঢুকতে দেবেন না। দুই ফুটবলারের সম্পর্ক এখনও এমন খারাপ। আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা মোটামুটি দুটো শিবিরে বিভক্ত। পাসারেল্লার শিবির একদিকে, অন্যদিকে মারাদোনার। পাসারেল্লা জীবনে কোনওদিন মারাদোনার বোকা জুনিয়র্স ক্লাবে ঢোকেননি। অন্যদিকে, মারাদোনাও কোনওদিন রিভারপ্লেট ক্লাবে যাননি। তবে দেশের হয়ে রিভারপ্লেট স্টেডিয়ামে খেলেছেন।

যাই হোক, আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স ক্লাবের কর্তারা সেই সময় বুঝে যান, মারাদোনাকে বেশিদিন তাঁরা ধরে রাখতে পারবেন না। তাঁকে রাখার জন্য ক্লাব থেকে যা খরচ হচ্ছে, তা বেশিদিন

boierpathshala.blogspot.com

জোগাড় করা যাবে না। হয় তাঁকে দেশেরই কোনও ক্লাবে লোন দিতে হবে। না হয় তাঁকে বিক্রি করে দিতে হবে ইউরোপের কোনও ক্লাবে। ১৯৮০ সালে, লাকস্তে বুঝলেন, মারাদোনাকে রিভারপ্লেট নেবে না। তাই বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। ওদিকে, জেনারেল মাসন খুব জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ফেলেছেন। সেটা থামানো দরকার। লাকস্তে ছিলেন ফিফার ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি বোকা জুনিয়র্সকে বললেন, এক বছরের জন্য মারাদোনাকে লোন নিতে।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে তখন একটা নিয়ম ছিল, দেশের কোনও প্লেয়ারকে ইউরোপে খেলতে দেওয়া হবে না। আসলে সামরিক বাহিনীর অফিসাররাই চাইছিলেন না, মারাদোনা বাইরে চলে যান। তাদের সাহায্যে ওই সময় এগিয়ে এল বারাস ব্রাভাস। স্টেডিয়ামে প্ল্যাকার্ড ঝুলল, "মারাদোনা নো সে ভেনদে, মারাদোনা নো সে ভা, মারাদোনা এস পাট্রিমোনিও নাসিওনাল।" অর্থাৎ কিনা, "মারাদোনা বিক্রির জন্য নয়। মারাদোনা কোথাও যাবে না। মারাদোনা আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ।"

কিন্তু মারাদোনার মতো প্রতিভা কী করে চাপা থাকবে? ইউরোপের এজেন্টরা খোঁজখবর নিতে থাকলেন। ১৯৬৬ সালে ইংল্যান্ডে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়েছিল আর্জেন্টিনার যে দলটা, তার অধিনায়ক ছিলেন র‍্যাটিন। সেই র‍্যাটিন, যাকে মাঠ থেকে রেফারি বের করে দেন রাফ ট্যাক্‌লের জন্য। ইংল্যান্ডের লোকেরা যাঁর সম্পর্কে বলেছিল, 'পশু'। সেই র‍্যাটিনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ইংল্যান্ডের শেফিল্ড ইউনাইটেডের। তিনিও মারাদোনা সম্পর্কে বিস্তৃত জানান শেফিল্ড ক্লাবের ম্যানেজার হ্যারি হাসলামকে। সুদূর লন্ডন থেকে হ্যারি উড়ে এলেন বুয়েনস আইরেসে। কিন্তু দরদামে পোষাল না।

হ্যারি হাসলাম ফিরে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এলেন ইতালির জুভেন্তাস ক্লাবের কর্তারা। তুরিনের এই ক্লাবটার মালিক ফিয়াট গাড়ির মালিক জিয়াননি অ্যাগনেলি। মারাদোনার সঙ্গে চুক্তি করার জন্য তিনি এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন ক্লাবের জিয়ামপিয়েরো বোনাপার্ট আর কোচ পিয়েত্রো গুইলিয়ানোকে।

boierpathshala.blogspot.com

বুয়েনস আইরেসে এঁদের হয়ে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন ওমার সিভোরি। একসময়কার খুব নামী ফুটবলার, যিনি আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা এনে দিয়েছিলেন। সিভোরি পরে ইতালিতে চলে যান। লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে তিনি ফিরে আসেন বুয়েনস আইরেসে।

এই ওমার সিভোরিই সবাইকে বোঝাতে লাগলেন, মারাদোনাকে আটকে রেখে লাভ নেই। ইতালিতে গিয়ে ও খেলুক। অ্যাগনেলিদের সঙ্গে তিনি বসিয়ে দিলেন সিস্টার্সপিলারকে। কথাবার্তা চলতে লাগল দু'পক্ষে। কিন্তু ১৯৮২-এর বিশ্বকাপ ফুটবল তখন সামনে। জুভেন্তাস কর্তারা যাওয়ার সময় বলে গেলেন, বিশ্বকাপের পর তাঁরা আবার আসবেন। সিস্টার্সপিলার প্রস্তাব দেন, দশ মিলিয়ন ডলারের। যা সেই সময়ের বাজারদরের তুলনায় বিরাট অঙ্ক। এজেন্ট হিসেবে সিস্টার্সপিলার তখন বেশ পোক্ত হয়েছেন। কাগজের সাংবাদিকদের ডেকে তিনি খবর দিলেন, জুভেন্তাস রেকর্ড ফি দিয়ে মারাদোনাকে নিতে চাইছে।

খবরটা কাগজে বেরনোর পরই আর্জেন্টিনায় ঝড় উঠল। সবার মুখে একটাই কথা, "ডিয়েগোকে ইউরোপ যেতে আমরা দেব না।"

॥ ৫ ॥

এত অর্থ, যশ সম্ভবত মারাদোনার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। একে বয়স কম, তার ওপর শিক্ষার অভাব, পৈতৃকসূত্রে পাওয়া উপজাতিসুলভ মানসিকতা। মারাদোনার মনে হল, তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। যা ইচ্ছে তাই বলতে পারেন। মাঠে তাঁর শিকার হতে শুরু করলেন রেফারিরা। যখন সেবোইতাসে খেলতেন, তখনই একবার রেফারির দিকে তেড়ে যাওয়ার জন্য মারাদোনা লাল কার্ড দেখেন। সেবোইতাসের হয়ে সেই সময় মারাদোনারা একটা রেকর্ড করেন। টানা ১৪০টা ম্যাচ জিতে।

মারাদোনা বিরাট ফুটবলার হতে যাচ্ছেন, এ-ব্যাপারে কারও

boierpathshala.blogspot.com

চলে এলেন বুয়েনস আইরেসে। কথা বলে নিলেন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স আর বোকা জুনিয়র্সের সঙ্গে। কিন্তু যত সহজে তিনি কবজা করলেন দুই ক্লাবের কর্তাদের, তত সহজে কায়দা করতে পারলেন না সিস্টার্সপিলারকে। নুনিয়েজের ধারণা হল, এই লোকটা মারাদোনার এজেন্ট বলছে বটে নিজেকে, কিন্তু ট্রান্সফার নিয়ে কথা বলার যোগ্য না। অন্যদিকে, সিস্টার্সপিলার ভেবে নিলেন, নুনিয়েজ লোকটা পাক্কা শয়তান। মারাদোনার যা দাম হওয়া উচিত, তা দিচ্ছে না। উলটে ঠকানোর চেষ্টা করছে।

টানা চারদিন দরকষাকষি হল। নুনিয়েজ বললেন, ৬০ লক্ষ ডলারের বেশি একটা পয়সাও দেবেন না। আর সিস্টার্সপিলার গোঁ ধরে রইলেন ৭০ লক্ষের নীচে একদম নামবেন না। বারবার বৈঠক ভেঙে যায়। আর মারাদোনার সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডায় সিস্টার্সপিলার নুনিয়েজকে নকল করে ভ্যাংচান। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ট্রান্সফার লড়াইয়ে জিতলেন নুনিয়েজই। হঠাৎ বলে বসলেন, ঠিক আছে ৭০ লাখেই সই। তবে চুক্তি ছ' বছরের জন্য করতে হবে। সিস্টার্সপিলারের সামনে তখন আর কোনও রাস্তা নেই। চুক্তি হয়ে গেল মারাদোনার সঙ্গে বার্সেলোনার। ঠিক তখনই ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফকল্যান্ড নিয়ে আর্জেন্টিনার যুদ্ধ চলছে।

১৯৮২ সালে বোকা জুনিয়র্সের হয়ে খেলার সময়ই মারাদোনা বুঝতে পারেন, বিশ্বকাপ আসছে। '৭৮-এর চ্যাম্পিয়ান দলের প্রধান অস্ত্র তিনিই। স্পেন থেকে যদি বিশ্বকাপ না আনতে পারেন, তা হলে দেশবাসীর চোখে তিনি খলনায়ক হয়ে যাবেন। পাসারেল্লার মতো কট্টর বিরোধীদের তখন তিনি সামলাতে পারবেন না। তাঁরা ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। একটা চাপ অনুভব করতে লাগলেন মারাদোনা। প্রচণ্ড চাপ। তারই কিছুটা তিনি বুঝতে পারলেন পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে প্রীতি ম্যাচে। সেদিন খেলা রিভারপ্লেট স্টেডিয়ামে। মাঠে ৮০ হাজার দর্শক। কিন্তু তাঁদের একেবারেই সন্তুষ্ট করতে পারলেন না মারাদোনা। জার্মানির ২১ বছর বয়সী মিডফিল্ডার লোথার ম্যাথুজ তাঁকে শেষ করে দিলেন। বল ধরলেই ম্যাথুজ ট্যাকল করতে লাগলেন। বাঁ পা-টা ফুলে গেল। শেষে এমন হল, দর্শকদের চাপে মারাদোনাকে

boierpathshala.blogspot.com

তুলে নিতে বাধ্য হলেন মেনোত্তি।

সেই প্রথম মারাদোনা বুঝতে পারলেন জন-দেবতার স্বরূপটা কী। তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। পরের প্রীতি ম্যাচ রাশিয়ার (পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর) সঙ্গে। সেই ম্যাচেও তিনি ব্যর্থ। গ্যালারি থেকে বিদ্রূপ ভেসে আসতে লাগল। সেইসঙ্গে মা-বাবাকে নিয়ে গালিগালাজ। মারাদোনা প্রাসাদোপম একটা বাড়ি কিনেছিলেন। সেই বাড়ি নিয়ে কটাক্ষ। শেষে তিনি সহ্য করতে পারলেন না। গ্যালারির দিকে তেড়ে গিয়ে দর্শকদের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়লেন। ফলে সমর্থকদের রোষ আরও বেড়ে গেল। যাঁরা তাঁকে দেশে রাখার জন্য একসময় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরাই তাঁর শাস্তির দাবি করলেন। মারাদোনা দেশবাসীর ওপর এমন চটে গেলেন, বুয়েনস আইরেস ছেড়ে সেদিন রাতেই চলে গেলেন এসকিনোয় তাঁদের পৈতৃক ভিটেতে। কাউকে কিছু না বলে।

উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বলেই বোধ হয় পরিবার এবং পৈতৃক ভিটের ওপর টান মারাদোনা বরাবর অনুভব করেছেন। আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সে সই করার পরই তিনি যে অর্থ পান, তা দিয়ে এসকিনোতে সম্পত্তি কিনেছিলেন মারাদোনা। এটা আসলে বাবাকে খুশি করার জন্য। চিতোরো শহরের অত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকেও ভোলেননি এসকিনোর কথা। মাঝেমধ্যেই সেখানে গিয়ে নির্জন প্রকৃতির মধ্যে থেকে বেঁচে থাকার আনন্দ অনুভব করতেন। নৌকোয় চড়ে মাছ ধরতেন। বাবার চরিত্রের এই দিকটা মারাদোনারও খুব পছন্দ। তিনি এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে আত্মগোপন করে রইলেন।

তবে বেশিদিনের জন্য নয়। তাঁকে ঠিক খুঁজে বের করলেন এক সাংবাদিক। 'ক্লারিন' পত্রিকার গিয়েরমো ব্লাঙ্কো। সেই সময় মারাদোনার প্রিয় সাংবাদিকদের মধ্যে একজন। তাঁকে দেখেই মুখ-চোখ কঠিন হয়ে উঠল মারাদোনার, "না, না, আমি কোনও কথা বলব না। আমাকে তুমি শান্তিতে থাকতে দাও।"

ব্লাঙ্কো বললেন, "এভাবে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারো না। সারা দেশ তোমাকে চাইছে। কেননা বিশ্বকাপের আর বেশিদিন

boierpathshala.blogspot.com

বাকি নেই।”

মারাদোনা বললেন, “বিশ্বকাপ নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। যারা সেদিন আমাকে হেনস্থা করেছে, তারা গিয়ে বিশ্বকাপে খেলুক। কাগজের লোকেদের সঙ্গেও আমার কোনও সম্পর্ক নেই। আমি যদি কিছু বলি, তা হলে তা বলব আমার বাবা-মাকে, আমার বান্ধবী ক্লাউদিয়াকে, আমার প্রিয় বন্ধুদের।”

ব্লাঙ্কো পিছু হটার জন্য অতদূর যাননি। তিনি বললেন, “তুমি এত রেগে আছ কেন? কিছু লোক গালাগালি দিয়েছে বলে, তুমি সবাইকে খারাপ ভাবছ কেন? ওরা তোমার কাছ থেকে আনন্দ চায়।”

মারাদোনার রাগ পড়েনি। তিনি বললেন, “আমি আর কারও জন্য ভাবি না। কাউকে আনন্দ দিতে চাই না। আমি যদি গোল করি, তা হলে আমার টিমের বাকি দশজনের জন্য করব। দর্শকদের জন্য নয়। ওরা ধৈর্যহীন। ওরা আমার সুবিধে-অসুবিধে বোঝে না। ওরা শুধু চাপ দেয়। এই চাপ আমি নিতে পারব না।”

“কিন্তু তোমাকে তো এই চাপ নিতে হবেই।”

“কেন নেব? তুমি লিখে দিও, আমি বিশ্বকাপ খেলব না। শুনছ, আমি স্পেনের বিশ্বকাপে যাব না। দেশেও থাকব না।”

“মনে হচ্ছে, তুমি কোণঠাসা হয়ে গেছ?”

“নিশ্চয়ই। মারাদোনা তো আর মেশিন নয়। মারাদোনা আর-পাঁচটা লোকের মতো সাধারণ মানুষ। মারাদোনার মধ্যেও সুখ-দুঃখ আছে। আমি একটা ম্যাচ বাজে খেললেই লোকে গালাগালি দেবে? কেন? কেন বলবে, ও মোটা হয়ে গেছে। ওর আরও বেশি প্র্যাকটিস করা উচিত। কেন আমার জন্য আমার মা-বাবা গালাগালি খাবেন? তুমি লিখে দিও, আমার মা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মা। আমার বাবা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বাবা। ওদের জন্য আমি সব কিছু ত্যাগ করতে রাজি...।”

এসকিনো থেকে ফিরে এসে মারাদোনা ট্রেনিংয়ে যাওয়ার কোনও আগ্রহ দেখালেন না। সেবারও টিমের কোচ মেনোত্তি। তিনি ভাবলেন, আগের বিশ্বকাপে তিনি ডিয়েগোকে বাদ

boierpathshala.blogspot.com

দিয়েছিলেন। বোধ হয় এখনও সেই রাগ পুষে রেখেছেন মারাদোনা। বিশ্বকাপ ফুটবলে না-খেলার সিদ্ধান্তটা আসলে তাঁকে জব্দ করার জন্যই। বুয়েনস আইরেসের কাছে একটা জায়গায় তিনি ক্যাম্প করেছিলেন। সেখান থেকে রোজ লোক পাঠাতে লাগলেন মারাদোনার কাছে। তাতে কোনও কাজ হল না দেখে, শেষে মেনোত্তি টিভি-সাক্ষাৎকারে বললেন, "ডিয়েগো না খেললে এবার আমাদের টিম দুর্বল হয়ে যাবে। মাঠের ৭৫ ভাগ অংশ ও-ই তো দখল করে রাখে। আমি চাই, ও খেলুক। দেশের সম্মানটা রাখার দায়িত্ব নিক।"

সেই সময় আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জেনারেল লিওপোল্ড গলতিয়েরি। মাত্র একবছর আগে বিনা রক্তপাতে হঠাৎ তিনি শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছেন। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল নয়। সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে বামপন্থীরা জনমত গঠন করছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে জেনারেল গলতিয়েরি ভাবলেন, এমন একটা চাল চালা যাক, যাতে সারা দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করা যেতে পারে। এক, ফুটবল খেলার মাধ্যমে এটা করা যেতে পারে। যা '৭৮ সালের বিশ্বকাপের সময় তাঁর পূর্বসুরিরা করেছিলেন। দুই, যে-কোনও ভাবে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে তা হতে পারে। তা হলে লোকে কিছুদিন অন্য সব সমস্যা ভুলে যাবে, দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার কথা ভেবে। আর্জেন্টিনায় তখন ঘনঘন হাতবদল হচ্ছিল ক্ষমতার। এবং গণতন্ত্রের কোনও বালাই ছিল না। সামরিক অফিসাররাই এটা করছিলেন। লোকে এত বীতশ্রদ্ধ যে, বুয়েনস আইরেসে আর্মি ট্রেনিং স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্রূপ করে বলত, "ওই দ্যাখো ওই স্কুল থেকে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট বেরোবে।"

আর্জেন্টিনায় বরাবর ফুটবলকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। এটা একেবারে পছন্দ করতেন না কোচ মেনোত্তি। তিনি তাঁর মত প্রকাশও করেছেন বহুবার। কিন্তু ব্রাজিলের কোচ জোয়াও সালদানহার মতো দৃঢ়ভাবে তা বলতে পারেননি। সালদানহাও ছিলেন তাঁর মতো সাংবাদিক। ফুটবল

boiepathshala.blogspot.com

নিয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। রেডিওতে ধারাভাষ্য দিতেন। ১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের কোচ হয়ে তিনি বলে দিয়েছিলেন, "পেলেকে না হলেও আমার চলবে। পেলে তো একা খেলবে না। ব্রাজিল খেলবে।"

সেই সময় ব্রাজিলেও শাসনক্ষমতা সামরিক বাহিনীর হাতে। দেশের প্রেসিডেন্ট এমিলিও গবাসতাজু মেডিসি। ব্রাজিল টিমের যখন কোচিং ক্যাম্প চলছে, সেই সময় প্রেসিডেন্ট মেডিসি একদিন সব ফুটবলারকে নেমন্তন্ন করলেন লাঞ্চে। কিন্তু সালদানহা সাফ বলে দিলেন, যাওয়া হবে না। প্র্যাকটিস সূচি ব্যাহত হবে। এর কয়েকদিন পর একজন সাংবাদিক সালদানহাকে জিজ্ঞেস করলেন, "দারিওকে টিমে নিলেন না কেন?" সালদানহা বললেন, "ওর থেকে টোস্টাও আর রোবার্তো বড় প্লেয়ার।" আপনি কি জানেন, দারিও আমাদের প্রেসিডেন্টের খুব ফেভারিট? সালদানহা জবাব দিয়েছিলেন, "তাই নাকি? আমি যেমন প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভা বেছে দিই না, তেমনই আশা করব, উনি আমার ফরওয়ার্ড লাইন বেছে দেবেন না।" এই কথা কাগজে বেরনোর পরই সালদানহা খারিজ হয়ে যান। কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয় মারিও জাগালোকে।

সালদানহার মতো ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন আর্জেন্টিনার মেনোত্তি। কিন্তু পারেননি। তাঁর ক্যাম্পে একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল গলতিয়েরি। ফুটবলারদের উৎসাহ দিতে। এলেন টিভি-র লোকজন নিয়ে। ক্যাম্পে ঢুকেই জড়িয়ে ধরলেন মারাদোনাকে। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী চাও, বলো?" উত্তরে মারাদোনা বললেন, "আমরা চাই আমাদের দেশকে বিশ্বের সেরা করতে।" আসলে তিনি বলতে চান, বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হতে। কিন্তু সামরিক বাহিনী এই কথাটাকে অন্য অর্থে ব্যবহার করল। রাজনীতির ফয়দা তোলার জন্য।

মারাদোনা বুঝতে পারলেন। এও টের পেলেন, তাঁকে রাজনীতিতে জড়ানোর একটা চেষ্টা চলছে। কিন্তু জড়ালে তাঁর নিজের ক্ষতি হবে। তাই তিনি বিদ্রোহ করে বসলেন।

boierpathshala.blogspot.com

সাংবাদিকদের ডেকে সাফ বলে দিলেন, "রাজনীতি আমি বুঝি না। বুঝতেও চাই না। আমাকে যেন এর মধ্যে জড়ানো না হয়।" এর সঙ্গে মারাদোনার রাগ গিয়ে পড়ল ফুটবল-কর্তাদের ওপর। কেন তাঁরা জেনারেল গলতিয়েরিকে ক্যাম্পে নিয়ে এলেন ? ফুটবল-কর্তাদের উদ্দেশে মারাদোনা যা ইচ্ছে তাই বলে দিলেন। "এঁরা আসেন আমার সঙ্গে ছবি তোলার জন্য। এর চেয়ে যদি এঁরা ফুটবলের কথা বলতেন, তা হলে কিছু উন্নতি হত।"

মারাদোনাকে দিয়ে ফয়দা তোলা গেল না দেখে জেনারেল গলতিয়েরি তাঁর দ্বিতীয় চালটা প্রয়োগ করলেন। অর্থাৎ যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলেন। ফকল্যান্ড দ্বীপের ওপর অধিকার নিয়ে প্রায় ১৫০ বছর ধরে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য চলছিল আর্জেন্টিনার। ব্রিটিশরা ওই দ্বীপ দখল করেছিলেন। ফকল্যান্ডকে মুক্ত করার জন্য গলতিয়েরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ব্রিটেনের বিরুদ্ধে। দু'পক্ষে বোমাবর্ষণ হতে থাকল। আর তারই মধ্যে আর্জেন্টিনা দল বিশ্বকাপ খেলতে গেল স্পেনে। সামরিক অফিসাররা দেশরক্ষার জন্য ডাক দিলেন। টিভি-তে দেখানো হল ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস করছেন আর্জেন্টিনীয় সেনারা। তারপরই পরদায় ফুটে উঠল ১৯৭৮ সালের বিশ্বকাপ জয়ের দৃশ্য। বলা হল, এবারের দলটাকে যিনি সমর্থন করবেন না, তিনি আর্জেন্টিনীয় নন, ইংরেজ। স্পেনে রওনা হওয়ার সময়ই মারাদোনারা টের পেলেন, হেরে ফিরে এলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

স্পেনে মারাদোনারা গিয়ে উঠলেন আলিকান্তে বলে একটা জায়গায়। প্রথম ম্যাচ বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। সহজেই জেতার কথা। মারিও কেম্পেস, মারাদোনা, আর্দিলেস, রামন ডিয়াজকে নিয়ে গড়া সেবার ফরওয়ার্ড লাইন। কে আটকাবে ? আর্জেন্টিনাই সেই ম্যাচে ফেভারিট। খেলার চারদিন আগে প্র্যাকটিসে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেলেন মারাদোনা। মেনোত্তির মাথায় হাত। তিনি শরণাপন্ন হলেন ডাক্তার রুবেন অলিভা-র। এই ভদ্রলোক একটু অদ্ভুত ধরনের। অন্য ডাক্তারদের মতো নন। ইনি ডাক্তারিবিদ্যার সঙ্গে ঝাড়ফুঁক প্রয়োগ করে চোট

boierpathshala.blogspot.com

সারান। অলিভা মনে করতেন, চোট আঘাত যতটা না শরীরের ব্যাপার, তার চেয়েও বেশি মনের। এই থেরাপি দিয়ে তিনি সারিয়ে তুললেন মারাদোনাকে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই আর্জেন্টিনা হেরে গেল। মারাদোনাকে খুঁজে পাওয়া গেল না সেদিন মাঠে।

পরের ম্যাচ হাঙ্গারির বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনা ৪-১ গোলে জিতল। সেই ম্যাচে মারাদোনা অবশ্য তাঁর জাদু দেখালেন। এর পর এল সালভাদোরকে হারিয়ে আর্জেন্টিনা পরের রাউন্ডে গেল। কিন্তু এই রাউন্ডে ইতালি আর ব্রাজিলের কাছে হার চ্যাম্পিয়ানদের ছিটকে দিল। ব্রাজিলের ম্যাচে লাল কার্ড দেখলেন মারাদোনা, বাতিস্তাকে মারাত্মক লাথি মারার জন্য। আসলে এল সালভাদোর ম্যাচ থেকেই তিনি মেজাজ হারাচ্ছিলেন। কেননা ইউরোপে বসে খবর পাচ্ছিলেন, ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনা পিছু হটছে। পুরো ফুটবল দলটাই মনমরা হয়ে গিয়েছিল এই খবর শুনে। এর ওপর এল সালভাদোরের কোচ সম্ভবত তাঁর প্লেয়ারদের নির্দেশ দিয়ে নামিয়েছিলেন, "মারাদোনাকে মারো।" তাঁরা পুরো ৯০ মিনিট সেই চেষ্টাই করে গেলেন। পরের ম্যাচে ইতালির ডিফেন্ডার জেন্টিলি বারবার মারাদোনার বাঁ পা লক্ষ্য করে লাথি চালালে মেনোত্তির মতো লোকও চিৎকার করে উঠেছিলেন, "কী ভেবেছ তোমরা ? এভাবে চ্যাম্পিয়ান হবে ?"

বিশ্বকাপ থেকে আর্জেন্টিনা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফকল্যান্ড যুদ্ধে আর্জেন্টিনা আত্মসমর্পণ করে বসল ব্রিটেনের কাছে। গলতিয়েরির কোনও ইচ্ছাই পূরণ হল না। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। আর্জেন্টিনার ফুটবল-দল মাথা নিচু করে দেশে ফিরে এল। সাংবাদিকরা ছিঁড়ে খেলেন মারাদোনাকে। কাগজে হিসেব বেরোল, তাঁর বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধুবান্ধব আর হবু শ্বশুরের পরিবারের জন্য আলিকান্তের হোটেলে মোট কত খরচ হয়েছে। হঠাৎই মারাদোনা খলনায়ক হয়ে গেলেন দেশবাসীর কাছে। ঘিয়ে আরও আগুন দিলেন পেলে। স্পেন থেকে তিনি ক্লারিন কাগজে লিখলেন, "আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, মারাদোনাকে লোকে যত বড় ভাবে, তত বড় কি না।"

তিন বছর আগে, ১৯৭৯ সালে রিও ডি জেনিরোতে

boierpathshala.blogspot.com

মারাদোনার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় পেলের। যুব দলের হয়ে সেখানে খেলতে যান মারাদোনা। পরিচয়টা করিয়ে দেন প্রাক্তন ফুটবলার বোচিনি। এইভাবে, "এ আমাদের ছোট্ট ডিয়েগো। এ একদিন আপনার জায়গা নেবে।"

"তাই নাকি?" বলে পেলে স্নেহচ্ছলে মারাদোনাকে জড়িয়ে ধরেন। তারপর থেকে পেলেকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলেন মারাদোনা। মাঝেমধ্যে চিঠিও লিখতেন। বিশ্বকাপ খেলবেন না মনস্থ করে মারাদোনা যখন এসকিনোতে চলে যান, তখন সেখান থেকেও তিনি মনের ইচ্ছে জানিয়ে পেলেকে চিঠি লেখেন। উত্তরে পেলে চিঠি দিয়ে বলেন, "পাগলামি কোরো না। ঈশ্বরে ভরসা রাখো। তুমি কত বড় ফুটবলার, তা প্রমাণ দেওয়ার জায়গা বিশ্বকাপ।" অনেকে বলেন, পেলের এই চিঠিই মারাদোনাকে ফের সিদ্ধান্ত বদলাতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

সেই পেলে এমন সমালোচনা করে ক্লারিন কাগজে লেখায় মারাদোনা মারাত্মক আঘাত পেলেন। সেদিনই তিনি মনে মনে ঠিক করেন, আর নয়। ইউরোপ চলে যাবেন। সেখানে গিয়েই তিনি প্রমাণ দেবেন, কত বড় ফুটবলার তিনি।

॥ ৬ ॥

লাতিন আমেরিকানরা ফুটবল খেলেন হৃদয় দিয়ে। আর ইউরোপিয়ানরা মস্তিষ্ক দিয়ে। লাতিন আমেরিকানরা ফুটবল চালান আবেগ দিয়ে। আর ইউরোপিয়ানরা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এই তফাতটা মারাদোনা খুব দ্রুত বুঝে গেলেন স্পেনে খেলতে গিয়ে। বার্সেলোনা ক্লাব বিশ্বের সেরা ক্লাবগুলির অন্যতম। এখানে মারাদোনা একা সুপারস্টার নন। যা তিনি ছিলেন আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সে বা বোকা জুনিয়র্সে। বার্সেলোনা ক্লাবে তিনি ১১ জন ফুটবলারের একজন। ইউরোপের মাটিতে পা দিয়েই মারাদোনা সেটা টের পেয়ে গেলেন। আরও অনুভব করলেন, ফুটবলার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঘরে ফেরার পথ বন্ধ। বাঁচতে গেলে, বার্সেলোনায়

boierpathshala.blogspot.com

তাঁকে যে করেই হোক, টিকে থাকতে হবে।

ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নুনিয়েজ সে-বছর একা মারাদোনাকে আনেননি। দলকে শক্তিশালী করার জন্য নিয়ে আসেন জার্মান তারকা বার্নড সুস্টার আর ডেনিস ফুটবলার অ্যালান সাইমনসেনকেও। ১৯৮০ সালে সুস্টার ইউরোপিয়ান কাপে দুর্দান্ত খেলেন। 'বার্কা' (অর্থাৎ বার্সেলোনার আদরের নাম) ভক্তদের কাছে তিনি খুবই পরিচিত। টিম যেদিন প্রথম প্র্যাকটিসে নামল, সেদিন প্রায় এক লাখ বার্কা সমর্থক ফুটবলারদের দেখতে এলেন। যথারীতি সুস্টারকে নিয়েই হইচই হল খুব বেশি। সেই সময় স্প্যানিশ লিগে নিয়ম ছিল, একটা ক্লাব তিনজন বিদেশিকে সই করাতে পারবে। কিন্তু ম্যাচে দু'জনের বেশি নামাতে পারবে না। প্রথম দিন প্র্যাকটিস দেখেই সবাই বুঝে গেলেন, কোপ পড়বে সাইমনসেনের ওপর। তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকতে হবে। খেলবেন সুস্টার আর মারাদোনা। লাতিন আমেরিকানদের খুব ভাল চোখে দেখতেন না স্পেনের লোকেরা। তাচ্ছিল্য করে তাঁদের বলতেন সুদাকাস। (যেমন আমাদের এখানে পূর্ববঙ্গের লোকেদের বলা হত বাঙাল)। মারাদোনা যতই মাঠের ভেতর ভেলকি দেখান, আসলে তো তিনি সুদাকাস। স্প্যানিশদের সমকক্ষ নন।

মারাদোনার এমনই কপাল, যেখানেই তিনি গেছেন, কোনও-না-কোনও ভাবে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। বার্সেলোনাতেও তার ব্যতিক্রম হল না। ক্লাবের সর্বেসর্বা প্রেসিডেন্ট নুনিয়েজ। তাঁর কথামতো যিনি চলেন না, তাঁকে ক্লাব থেকে বের করে দেন। যে পরিমাণ অর্থ দিয়ে তিনি মারাদোনাকে নিয়ে আসেন, সেই সময় সেটা রেকর্ড। এ নিয়ে কানাঘুষো চলছিল। ক্লাবের অন্য ডিরেক্টররা তো বটেই, প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কর্তারাও এ নিয়ে কটাক্ষ করতে থাকলেন নুনিয়েজকে। স্পেনের উত্তর দিকে বার্সেলোনা। দক্ষিণে রিয়াল মাদ্রিদ। এই দুই ক্লাবের লড়াই ফুটবলের মধ্যেই সীমায়িত নয়। উত্তরের লোকেরা হলেন কাতালুনিয়ান।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো যখন স্পেনের প্রেসিডেন্ট, তখন

boierpathshala.blogspot.com

কাতালুনিয়ানরা অনেক বঞ্চনার শিকার হন। বহুদিন ধরে তাঁরা স্পেন থেকে বেরিয়ে আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন। মারাদোনা স্পেনে খেলতে যাওয়ার সাত বছর আগে জেনারেল ফ্রাঙ্কো মারা যান। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাতালুনিয়ানদের ক্ষোভের আগুন তখনও নেভেনি। তাই রিয়াল মাদ্রিদ যখন বার্সেলোনায় খেলতে যায়, তখন কাতালুনিয়ানদের যত রাগ গিয়ে পড়ে ফুটবলারদের ওপর। খেলাটা তখন আর শুধু ফুটবলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। মাঠটা হয়ে যায় রাজনৈতিক মঞ্চ। নুনিয়েজ তখন আর শুধু বার্কা-র প্রেসিডেন্ট নন, কাতালুনিয়ানদের উদ্ধারকর্তা বা মেসিয়া।

মারাদোনা এসব কথা জানতেন না। বার্সেলোনায় এসে জানলেন। তিনি ঠিক করে নিলেন, রাজনীতির আকচাআকচিতে জড়াবেন না। দেশে শিক্ষা হয়ে গেছে। নুনিয়েজ তাঁকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবেন, এটা তিনি হতে দেবেন না। বার্সেলোনার অভিজাত অঞ্চল পেড্রালবেসে তিনি একটা বিরাট বাড়ি কিনে ফেললেন। দেশ থেকে নিয়ে এলেন তাঁর বাবা-মা, আট ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, ক্লাউদিয়া আর ব্যক্তিগত 'ট্রেনার' সিগনোরিনিকে। নিজের চারপাশে একটা মানব-দেওয়াল তৈরি করে ফেললেন। বার্কার নোউ ক্যাম্প স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস সেরে তিনি ঢুকে পড়তেন পেড্রালবেসের বাড়িতে। ব্যস, তারপর আর তাঁকে পাওয়া যেত না। স্প্যানিশ লিগটা মারাদোনা শুরু করলেন চমৎকারভাবে। টিমের কোচ তখন জার্মান উদো লাটেক। মারাদোনা আর সুস্টারকে দিয়ে তিনি দুর্দান্ত 'কম্বিনেশন' গড়ে তুললেন। খেলা দেখে বার্কা-ভক্তরা খুব খুশি। কিন্তু মারাদোনার কপালে সুখ নেই। ক্লাবের সঙ্গে তুচ্ছ একটা ব্যাপারে তাঁর মনোমালিন্য হয়ে গেল। একটা ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন মারাদোনা। ক্লাবের চিকিৎসকরা যখন দেখতে এলেন, মারাদোনা তখন বলে দিলেন, তিনি ব্যক্তিগত চিকিৎসক, রুবেন অলিভা ছাড়া আর কারও চিকিৎসা নেবেন না। মিলান শহর থেকে উড়িয়ে আনা হল ডাক্তার অলিভাকে। এতে বার্সেলোনার অনেকে চটলেন। কিন্তু মারাদোনা নিজের ইচ্ছেয় চলেন। বার্সেলোনার সঙ্গে তাঁর চুক্তি স্রেফ খেলার। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি অন্য

boierpathshala.blogspot.com

কাউকে নাক গলাতে দেবেন কেন ?

সেই সময় মারাদোনার খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন কারাসকো নামে একজন স্প্যানিশ ফুটবলার। তিনি বারণ করেছিলেন, যদি নাইট ক্লাবে যাও, তা হলে শুক্র-শনিবার যেয়ো না। একবার পাপারাৎজিদের পাল্লায় পড়লে, খুব মুশকিলে পড়ে যাবে। পাপারাৎজি মানে ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার। কারাসকোর কথা শুনে মারাদোনা উলটোটাই করতে থাকলেন। দলবল নিয়ে শুক্র-শনিবার তিনি নাইট ক্লাবে যেতে থাকলেন। একবার বার্সেলোনার এক অভিজাত ক্লাবে মারপিটও করে এলেন। কেননা, ওই ক্লাবে তাঁকে ভি আই পি-দের মতো আপ্যায়ন করা হয়নি। এই ঘটনা ফলাও করে কাগজে বেরোল। পড়ে চটে গেলেন নুনিয়েজ। মাঝেমধ্যেই তাঁর কাছে খবর যাচ্ছিল, পেড্রালবেসের বাড়িতে মারাদোনা কোকেন নেন। তিনি স্থির করে নিলেন, মারাদোনার এই আচরণ বরদাস্ত করবেন না।

কোচ লাটেকের সঙ্গেও মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। টানা কয়েক মাস খেলে বিশ্রাম চেয়েছিলেন মারাদোনা। লাটেক রাজি হলেন না। প্রীতি ম্যাচ খেলতে প্যারিস যাওয়ার আগে অনিচ্ছুক মারাদোনা কথা-কাটাকাটি করলেন ক্লাব-কর্তাদের সঙ্গে। বললেন, "আমার মতো বোনাস ক্লাবের সব প্লেয়ার কেন পাবে না ?" এটা বলে মারাদোনা টিমের সব প্লেয়ারদের মন জিতে নিলেন। প্যারিসে সেন্ট গামাঁকে ৪-১ গোলে হারিয়ে মারাদোনা টিমের অর্ধেক প্লেয়ারকে নিয়ে ছুটলেন নাইট ক্লাবে উৎসব করতে। পরদিন এই খবর পৌঁছে গেল নুনিয়েজের কাছে। তিনি কড়া চিঠি দিলেন, "অতঃপর নাইট ক্লাবে যাওয়া চলবে না।" মারাদোনাও একই ভাবে উত্তর দিলেন, "আমি কোথায় যাব বা যাব না, তা আপনার এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না।"

এর পর নুনিয়েজের সঙ্গে কথা বলাও বন্ধ হয়ে গেল মারাদোনার। ফের বিরোধ, এবার সুস্টারকে সঙ্গে পেয়ে গেলেন মারাদোনা। জার্মান ফুটবলার পল ব্রাইটনারের বেনিফিট ম্যাচ ছিল মিউনিখে। তিনি আমন্ত্রণ জানালেন, সুস্টার আর মারাদোনাকে তাঁর টিমের হয়ে খেলার জন্য। দু'জনই ব্রাইটনারকে

boierpathshala.blogspot.com

খুব শ্রদ্ধা করতেন। তাই খেলতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু মিউনিখ যাওয়া আটকে দিলেন নুনিয়েজ। আর চারদিন পর কিংস কাপ ফাইনাল। অতএব যাওয়া চলবে না। মাসকয়েক আগে লাটেক বিদায় নিয়েছেন। নতুন কোচ হিসেবে এসেছেন আর্জেন্টিনা থেকে মেনোত্তি। তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু নুনিয়েজ মিউনিখ যেতে দিলেন না। নুনিয়েজ যোহান ক্রুয়েফের মতো কিংবদন্তি ফুটবলারকে কখনও মাথায় চড়তে দেননি। মারাদোনা কোন ছার। ফুটবলারদের বিদ্রোহ কী করে সামলাতে হয়, তিনি জানেন।

মাঝে একদিন প্র্যাকটিস করতে আসার সময়, বার্কা-ভক্তদের হাতে মার খেলেন মারাদোনা। তিনি বুঝলেন, এর পেছনে কে? তা সত্ত্বেও, ব্যাপারটা নিয়ে হইচই করলেন না। নুনিয়েজ মারাদোনার পাশপোর্ট বাজেয়াপ্ত করে রাখলেন। যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন। মারাদোনার সঙ্গে তাঁর 'ইগো'র লড়াই শুরু হয়ে গেল। মারাদোনা কিছু বললেন না। কিংস কাপ ফাইনালে রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে দেওয়ার পর, নুনিয়েজ যখন তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে এলেন, তখন মারাদোনা তাঁকে অবজ্ঞা করলেন। বার্কা-ভক্তরা তখন তাঁকে মাথায় করে নাচছেন। নুনিয়েজকে তিনি গুরুত্ব দেবেন কেন? সেদিন ওই আনন্দোৎসবের মাঝে মারাদোনা জানতেন না, মারাত্মক একটা দিন আসছে। যার ফলে তাঁকে বেশ কিছুদিন ফুটবল থেকে সরে থাকতে হবে।

বার্সেলোনা দলটাকে মেনোত্তি যে স্টাইলে খেলাচ্ছিলেন, তা অনেকের পছন্দ হচ্ছিল না। এ নিয়ে টিভি-তে অনেকেই অনেকরকম মতামত দিচ্ছিলেন। কট্টর সমালোচনা করেন অ্যাথলেটিকো বিলবাও-য়ের কোচ জেভিয়ার ক্লেমেন্তে। মেনোত্তি বিশ্বকাপজয়ী টিমের কোচ। তিনি ক্লেমেন্তেকে সহ্য করবেন কেন? ক্লেমেন্তের টিমের বদনাম ছিল মারকুটে খেলার জন্য। সেটা কটাক্ষ করেই মেনোত্তি টিভি-তে একদিন বলে বসলেন, "বাইসনের মতো আচরণ না করে স্পেনের ফুটবলাররা যেদিন থেকে বুল ফাইটারের মতো কৌশল আয়ত্ত করবে, সেইদিন স্প্যানিশ ফুটবল উন্নতি করবে।" ক্লেমেন্তেও চুপ করে থাকার

boierpathshala.blogspot.com

মানুষ নন। তিনি পালটা বললেন, "মেনোত্তির মতো সুদাকাসের কাছে তাঁরা ফুটবল শিখবেন না।" দুই কোচের কথার লড়াই (ঠিক আমাদের প্রদীপ ব্যানার্জি আর অমল দত্তের মতো।) টেনশন বাড়িয়ে দিল স্প্যানিশ লিগে।

এর মাঝে এসে পড়ল বার্সেলোনা আর বিলবাওয়ের ম্যাচ। খেলা বিলবাওয়ের মাঠে। রক্তক্ষয়ী ম্যাচ। দুই কোচের সম্মান রাখতে গিয়ে ফুটবলাররা সেদিন আইনকানুন আর মানলেন না। অবাধে হাতাহাতি চলতে থাকল। বিলবাওয়ের ডিফেন্ডার গোয়কোচিয়া দ্বিতীয়ার্ধে এমন মারলেন মারাদোনাকে, স্ট্রেচারে করে তাঁকে তুলে আনতে হল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দেখা গেল মারাদোনার গোড়ালির হাড় দু'টুকরো হয়ে গেছে। সেখানে শুয়েই তিনি শুনলেন, বিলবাও ২-০ গোলে জিতছে। গোয়কোচিয়ার ফাউল নিয়ে পরে জলঘোলা হয়। তাঁর নামই হয়ে যায় বিলবাওয়ের কসাই। মেনোত্তি চেঁচামেচি করায়, গোয়কোচিয়া ১০ ম্যাচ সাসপেন্ড হন। কিন্তু ওই ম্যাচ জিতে জেভিয়ার ক্লেমেন্তে স্পেন দলের কোচ হয়ে যান। হাসপাতালের ডাক্তার পরে গোয়কোচিয়াকে একটা স্মারক উপহার দিয়েছিলেন। মারাদোনার গোড়ালির হাড়। এখনও সেটাকে যত্ন করে বাড়িতে সাজিয়ে রেখেছেন গোয়কোচিয়া। এই ঘটনাটা খুব দাগ কেটে যায় মারাদোনার মনে। তিনি ও সিস্টার্সপিলার ঠিক করে নেন, আর নয়। স্পেন শিল্পী ফুটবলারদের জায়গা নয়। ডেরা বাঁধতে হবে অন্য কোথাও।

অন্য আরও কারণ ছিল। বার্সেলোনা ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করার সময় সিস্টার্সপিলার মারাদোনার ব্যক্তিগত 'স্পনসর' নেওয়ার অধিকার নিজের হাতে রেখেছিলেন। মারাদোনাকে নিয়ে যে ব্যবসা তিনি আশা করেছিলেন, তা হল না। বার্সেলোনা টিম লিগ এবং ইউরোপিয়ান কাপে ভাল ফল করতে পারল না। প্রথমে লাটেক, তারপর মেনোত্তি খারিজ হলেন। মারাদোনাও কিছুদিন হেপাটাইটিসে ভুগলেন। তারপর বিলবাওয়ে সেই চোট। বেশ কয়েকটি স্পনসর সরে গেল। বার্সেলোনায় মারাদোনা জীবনযাপন করতেন রাজরাজড়াদের মতো। তাঁর পরিবারের

boierpathshala.blogspot.com

লোকজনরাও ইচ্ছেমতো খরচ করতেন। একটা সময় পুঁজি ফুরিয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি খরচ হল মারাদোনার নিজস্ব কোম্পানি—মারাদোনা প্রোডাকশনসের জন্য। এই কোম্পানি মারাদোনার ওপর ফিল্ম তৈরি করছিল। সেই ফিল্ম কেনার জন্য কাউকে পাওয়া গেল না। মারাদোনার চেক 'বাউন্স' করতে লাগল। ঋণে জর্জরিত হয়ে, প্লাস্টার পায়ে ঘরে বন্দি হয়ে রইলেন তিনি। এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধারের একটাই উপায় ছিল তখন, অন্য ক্লাবে ট্রান্সফার নেওয়া।

বার্সেলোনা ক্লাবে ওই সময় কোচ হিসেবে এলেন টেরি ভেনাবেলস। তিনি ইংরেজ বলে মারাদোনা প্রথমদিকে মেশামেশি করতেন না। কেননা ফকল্যান্ড যুদ্ধের কথা ভোলেননি। কিন্তু চোট সারিয়ে মাঠে ফিরে আসার পর তিনি বুঝতে পারলেন, ভেনাবেলস লোকটা খারাপ নন। প্লেয়ার্সম্যান। ফের তিনি মন দিয়ে খেলতে লাগলেন। বার্কা-সমর্থকরাও খুশি। কিন্তু বিতর্কের বাইরে বেশিদিন থাকার পাত্র নন মারাদোনা। পরের বছর কিংস কাপের ফাইনালে বিলবাও ক্লাবের কাছে হারার পর, খেলার শেষে স্পেনের রাজা খুয়ান কার্লোসের সামনেই বিপক্ষের সোলা বলে একজন ফুটবলারের মুখে ঘুসি মারলেন। দু'পক্ষের প্লেয়ারদের মধ্যে মারপিট শুরু হয়ে গেল। স্পেনের ফুটবল ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। মারপিট থামার পর সেদিনই নুনিয়েজ বোর্ড মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন, মারাদোনার মতো অশিক্ষিত, দুর্বিনীত ফুটবলার তিনি রাখবেন না।

এবার ক্লাব খুঁজে বের করার পালা। সিস্টার্সপিলার যোগাযোগ রেখে যেতে লাগলেন ইতালিয়ান ক্লাবগুলোর সঙ্গে। কিন্তু স্পেনের খবর ইতালিতে পৌঁছতে বেশি সময় লাগে না। কেউ এরকম খেয়ালি, বদমেজাজি ফুটবলারকে নিতে চায় না। শেষে এগিয়ে এল নাপোলি। দক্ষিণ ইতালির একটা ক্লাব। নাপোলি হল গডফাদারদের স্বর্গ। মাফিয়ার বাস। ইতালি ভাষায় মাফিয়া মানে কামোরা। নাপোলি ক্লাবটা তাই কামোরাদের মদতে চলে। এই ক্লাবটা রাজি হয়ে গেল মারাদোনাকে নিতে। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে বার্সেলোনা ক্লাবে থাকার সময়ই মারাদোনা আর

boierpathshala.blogspot.com

সিস্টার্সপিলার গোপনে কথা বলতে গেলেন নাপোলির কাছে এক অখ্যাত দ্বীপে। নাপোলির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন মারাদোনারা। প্রাথমিক কথাবার্তার পর দু'জনে ফের ফিরে এলেন বার্সেলোনায়। নুনিয়েজ এই সুযোগটাই এতদিন খুঁজছিলেন। মারাদোনাকে তিনি বিক্রি করে দিলেন নাপোলিতে।

নাপোলিতে পাকাপাকি যাওয়ার আগে, সিস্টার্সপিলার বুঝতে পারলেন, মারাদোনাকে নিয়ে স্পেনে তিনি যেভাবে ব্যবসা করেছেন, ইতালিতে তা করতে পারবেন না। মারাদোনার জন্য হোটেল দেখতে মাঝে নাপোলিতে গিয়ে তিনি চমকে গেলেন। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে যাওয়ার পথে হঠাৎ তিনি দেখলেন, রাস্তায় মারাদোনার গানের ক্যাসেট বিক্রি হচ্ছে। এই ক্যাসেট তিনিই বের করেছেন মারাদোনা প্রোডাকশনের হয়ে। ইতালিতে এই ক্যাসেট বিক্রির স্বত্ব তাঁর কাছ থেকে কেউ নেননি। তা সত্ত্বেও বিক্রি হচ্ছে কীভাবে? রাস্তায় নেমে তিনি দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ক্যাসেট কোত্থেকে পেলেন?" দোকানদার বললেন, "জানি না।" মারাদোনা যে নাপোলিতে খেলবেন, তা ফাঁস করে দিয়েছিলেন ইতালির সাংবাদিকরা। আর তারপরই তাঁকে নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়ে যায়।

চমকের আরও বাকি ছিল সিস্টার্সপিলারের। রাস্তায় তিনি দেখলেন, একটা বাচ্চা ছেলে 'মার্লবোরো সিগারেট' বিক্রি করছে 'মারাদোনা সিগারেট' বলে। সিস্টার্সপিলার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি মার্লবোরো সিগারেটকে মারাদোনা সিগারেট বলে বিক্রি করছ কেন?" ছেলেটি উত্তর দিল, "বেশি বিক্রি হচ্ছে বলে।" শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন সিস্টার্সপিলার। সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, মারাদোনাকে নিয়ে বেআইনি ব্যবসা করা চলবে না। তিনি পুলিশের কাছে অভিযোগ করবেন। পরদিনই তিনি চিঠি পেলেন কামোরা-দের কাছ থেকে। নাপোলিতে বাস করে কামোরাদের সঙ্গে যে ঝগড়া করে, সে মূর্খ।

ইতালিতে ফুটবল সমর্থকদের বলে 'তিফুসি'। তা, নাপোলির তিফুসিরা রাজকীয় সংবর্ধনা জানালেন, মারাদোনা যখন পাকাপাকি

boiepathshala.blogspot.com

ভাবে নাপোলিতে এলেন। আর্থিক দুরবস্থা কেটে গেছে। মারাদোনা আবার পুরনো মারাদোনা। নাপোলিতে কোনও বাধানিষেধ নেই। যেখানে খুশি তিনি যেতে পারেন। যা খুশি তাই করতে পারেন। রোজ রাত্তিরে এক-এক মাফিয়ার বাড়িতে পার্টি। বিলাসবহুল আয়োজন। মারাদোনা অনুভব করলেন, তিনি বুয়েনস আইরেসে রয়েছেন। স্পেন থেকে তিনি পরিবারের সবাইকে নিয়ে এলেন। ভিয়া সিপিওনে কাপিসি বলে একটা জায়গায় তিনি তিনতলা একটা বাড়ি কিনে নিলেন। এই জীবনের স্বপ্নই তিনি সারা জীবন দেখে এসেছেন। ধনী বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে থাকবেন।

মারাদোনা একটা ইয়ট, বেশ কয়েকটা গাড়ি কিনে ফেললেন। এর মধ্যে একটা 'রোলস রয়েস'। একটা 'ফেরারি টেস্টারোসা'। কোথায় যেন তিনি শুনেছিলেন, ফেরারি টেস্টারোসা গাড়ি ব্যবহার করেন হলিউডের তারকা সিলভেস্টার স্ট্যালোন। এই ধরনের গাড়ি চট করে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিস্টার্সপিলারের পক্ষে কোনও কিছুই কঠিন নয়। ওই কোম্পানির মালিক জিয়াননি অ্যাগনেলি জুভেন্তাস ক্লাবের মালিক। সিস্টার্সপিলার তুরিনে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বোঝালেন, মারাদোনা ফেরারি চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এটা কোম্পানির প্রচারের পক্ষে ভাল হবে। অ্যাগনেলি দেখলেন, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফেরারির ব্যবস্থা করে দিলেন। নাপোলি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব। তার প্লেয়ার ফেরারি চড়ে বেড়াচ্ছেন, মন্দ কী ? নাপোলির তিফুসিদের আপন করে নিতে মারাদোনার বেশিদিন সময় লাগল না। মারাদোনার জন্যই ইতালির লিগে নাপোলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগল এ সি মিলান, ইন্টার মিলান, জুভেন্তাস, পার্মা, ফিওরেন্তিনার মতো টিমকে।

১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি আর্জেন্টিনা টিমের ফুটবলার অস্কার রুগেরি এক ভদ্রলোককে মারাদোনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। নাম গিলারমো কপোলা। ভদ্রলোকের কথাবার্তায় মারাদোনা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজের ওজন বুঝতে পারছেন। সঙ্গে আছেন মাফিয়ারা। তাঁদের হাত

boierpathshala.blogspot.com

অনেক লম্বা। মারাদোনা নিরাপদ বোধ করছেন তাঁদের সঙ্গে। কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য মাফিয়ারা নানারকম কারচুপির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ওই সময় হঠাৎ মারাদোনার মনে হল, সিস্টার্সপিলারকে রাখার আর দরকার নেই। কেউ একজন তাঁর মাথায় ঢোকালেন, ম্যানেজার বেহিসেবি খরচ করে গেছেন বলেই বার্সেলোনায় তিনি আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন।

সিস্টার্সপিলার এসব কিছুই বুঝতে পারেননি। তিনি তখন মেক্সিকোয়। একটা স্পনসর ধরার চেষ্টায় সেখানে গেছেন। মেক্সিকোয় সেদিন প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল। প্রচুর লোক মারা গেলেন। সিস্টার্সপিলার যে হোটেলে ছিলেন, আশ্চর্যরকম ভাবে সেই হোটেল অক্ষত ছিল। পরদিন সকালে সিস্টার্সপিলার নাপোলি থেকে ফোন পেলেন। মারাদোনার জামাইবাবু গ্যাব্রিয়েল এসপোসিতো খবর দিলেন, "তোমার চাকরি গেছে।" ভূমিকম্পের জন্য মেক্সিকোর টেলি-যোগাযোগ ব্যাহত হয়েছিল। পুরো কথা ভাল করে শোনার আগেই লাইনটা কেটে গেল। সিস্টার্সপিলার ভাবলেন, কেউ বোধ হয় তাঁর সঙ্গে ঠাট্টা করছেন। তাই নাপোলিতে ফোন করে তিনি ধরার চেষ্টা করলেন মারাদোনাকে। সারাদিন চেষ্টা করে যখন তিনি লাইন পেলেন, তখন বুঝলেন খবরটা সত্যি। মারাদোনা নিজেই বললেন, তিনি নতুন ম্যানেজার রেখেছেন— গিলারমো কপোলাকে।

সিস্টার্সপিলার আর কোনওদিন নাপোলিতে যাননি। মারাদোনাও তাঁর ছেলেবেলার বন্ধুকে গুরুত্ব দেননি। দু'জনের সম্পর্কটা এমন হয়ে যায় যে, ১৯৯৫ সালে মারাদোনা যখন ক্লাউদিয়াকে বিয়ে করলেন, তখন সিস্টার্সপিলারকে তিনি নেমন্তন্নও করেননি। মারাদোনার ব্যবহারে আহত হলেও সিস্টার্সপিলার কিন্তু একটা কথাও বলেননি। ছেলেবেলায় মারাদোনাকে তিনি রোজ বাড়িতে ডেকে এনে খাওয়াতেন। স্নান করার সুযোগ দিতেন। সিনেমা-থিয়েটারে নিয়ে যেতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি পড়ার সুযোগ পেয়েও তিনি পড়তে যাননি স্রেফ মারাদোনার ম্যানেজার হবেন বলে। সারা জীবন তিনি নিজের কথা ভাবেননি। মারাদোনার আত্মীয়রা ইচ্ছেমতো খরচ

boierpathshala.blogspot.com

করে যেতেন। তখন সাবধান করা সত্ত্বেও, মারাদোনা শোনেননি। ষড়যন্ত্রটা কারা করেছেন, তা বুঝেও সিস্টার্সপিলার চুপ করে রইলেন। মারাদোনাকে কিন্তু তিনি ভোলেননি। পরে নিজের ছেলের জন্মদিনে সিস্টার্সপিলার তাকে একটা ১৩ নম্বর জার্সি উপহার দেন। ৩ নম্বর জার্সি পরতেন তাঁর নিজের দাদা এডুয়ার্ডো, ফুটবল খেলতে-খেলতেই যিনি মারা যান। আর ১০ নম্বর জার্সি মারাদোনার, যাকে সিস্টার্সপিলার সারা জীবন নিজের ভাই বলেই মনে করে এসেছেন।

॥ ৭ ॥

নাপোলি ক্লাবে মারাদোনা মানিয়ে নেওয়ার মাঝেই এসে গেল মেক্সিকো বিশ্বকাপ। তিন বছর আগে আর্জেন্টিনা দলের কোচ নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাঃ কার্লোস বিলার্ডো। ইনি কর্নেখোর প্রতিবেশী ছিলেন। সেই কর্নেখো যিনি সেবোইতাস ক্লাবের কোচ। মারাদোনাকে ছেলেবেলায় খেলা শিখিয়েছেন। বিলার্ডো এই কর্নেখোর কাছেই অনেক কথা শোনেন মারাদোনা সম্পর্কে। জাতীয় দলের দায়িত্ব পাওয়ার পরই তিনি একবার বার্সেলোনা গেলেন মারাদোনার সঙ্গে আলাপ করার জন্য। প্রথমদিন টানা পাঁচ ঘণ্টা গল্প করলেন দু'জনে। রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত। বিলার্ডো বুঝে গেলেন, মেক্সিকোতে যদি চ্যাম্পিয়ান হতে হয়, তা হলে এই ছেলেটাকে তাঁর দরকার। ডিয়েগো মারাদোনা একাই বিশ্বকাপ জেতার ক্ষমতা রাখেন।

মারাদোনাকে বিলার্ডোর এমন ভাল লেগে গেল যে, প্রথম দিনই প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, "তুমি আর্জেন্টিনা দলের ক্যাপ্টেন হবে।" দু'জনের মধ্যে একটা ব্যাপারে অসম্ভব মিল। দু'জনই নিয়ম-শৃঙ্খলার বাইরে। মারাদোনা নাইট ক্লাবে গিয়ে হইহুল্লোড় করতেন। গভীর রাতে ঘুমোতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। বিলার্ডোও তাই। ডাক্তারি পড়ার সময় গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন তিনি। সেজন্য যে ক'দিন তিনি বার্সেলোনায় ছিলেন, তাল মিলিয়ে চললেন মারাদোনার সঙ্গে। বিলার্ডো লক্ষ করেছিলেন,

boierpathshala.blogspot.com

মায়ের ব্যাপারে মারাদোনা অসম্ভব স্পর্শকাতর। তাই কথাবার্তার সময় মারাদোনার পাশে বসা তাঁর মাকে বিলার্ডো যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

আর্জেন্টিনার কোচদের মধ্যে দু'টি ঘরানা। একদল মেনোত্তির অনুগামী। অন্য দল বিলার্ডোর। মেনোত্তির ফুটবল দর্শনের কথা আগেই বলেছি। বিলার্ডোর দর্শন একটাই—জয়। যে-কোনও উপায়েই হোক জিততে হবে। বিলার্ডো আর্জেন্টিনা ফুটবলের পুরনো ঘরানায় বিশ্বাসী। ফুটবলটা হল পুরুষদের খেলা। নিজে খেলতেন 'এসতুডিয়েন্তে' নামে একটা ক্লাবে। ছয়ের দশকে সেটা মারকুটে টিম বলে পরিচিত ছিল। এসতুডিয়েন্তে বিলার্ডোদের সময় দু'বার দক্ষিণ আমেরিকার ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। তারপর বিশ্ব ক্লাব কাপের খেলায় একবার এ সি মিলান, অন্যবার ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ক্লাবের বিরুদ্ধে এমন রাফ খেলেছিল, ইউরোপে আর্জেন্টিনা ফুটবল সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা হয়ে যায়। বিলার্ডো নিজে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের নবি স্টাইলসের চোয়াল ভেঙে দিয়েছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু পাচামে ভাঙেন ববি চার্লটনের সিনবোন।

বিলার্ডো পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। কিন্তু ডাক্তারি করতেন না। ব্যবসা কাঠের আসবাবপত্রের। সেইসঙ্গে ফুটবল কোচিং। নিজে ডাক্তার হওয়ার জন্য অন্য কোচদের থেকে খানিকটা বাড়তি সুবিধে পেতেন। মাদকাসক্ত মারাদোনাকে দিয়ে তিনি যেভাবে বিশ্বকাপ জিতে নিয়ে যান, অন্য কেউ তা পারতেন কিনা সন্দেহ। ১৯৭৮ আর ১৯৮২ সালের তুলনায় ১৯৮৬ সালের আর্জেন্টিনা টিম এমন কিছুই ছিল না। তারপর টিমে প্রচণ্ড খেয়োখেয়ি। একদিকে পাসারেল্লার দল। তাতে মেনোত্তির আমলের কয়েকজন প্রবীণ প্লেয়ার। অন্য দিকে, মারাদোনার প্রতিভায় আকৃষ্ট তরুণ ফুটবলাররা। প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে বিলার্ডো মোট ৩৪টি ম্যাচ খেললেন 'কোয়ালিফাইং রাউন্ড' আর বিদেশে আমন্ত্রণী টুর্নামেন্টে। মাত্র ১৩টি ম্যাচে জিতলেন। পারফরম্যান্স এমন কিছুই না। এর মধ্যে বিলার্ডো কলকাতায় নেহরু কাপ ফুটবলও খেলতে আসেন। মনে আছে, ১৯৮৪ সালে সেবার চ্যাম্পিয়ান

boierpathshala.blogspot.com

হতে না পেরে তিনি খুব গালাগালি দিয়ে গিয়েছিলেন।

চূড়ান্ত ক্যাম্পে পাসারেল্লার সঙ্গে একদিন মারাদোনার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে গেল। প্রাক্তন অধিনায়ক পাসারেল্লা বরাবরই মনে করতেন, মারাদোনাকে ফাঁপিয়ে দেখানো হচ্ছে। তিনি মেনোত্তির কাছে একটা জিনিস শেখেন, তা শৃঙ্খলা। মারাদোনার বোহেমিয়ান জীবন তিনি পছন্দ করছেন কেন? একদিন রাতে হোটেলে মারাদোনার ঘরে পার্টি চলছে। হইহুল্লোড়ে অন্যদের ঘুমোতে অসুবিধে হচ্ছে। পাসারেল্লা বাধ্য হয়ে মারাদোনার ঘরে ঢুকে মেজাজ দেখালেন, "আর্জেন্টিনা টিমের ক্যাপ্টেন হতে যাচ্ছ। ক্যাপ্টেনের মতো আচরণ করছ না কেন?" মারাদোনা বললেন, "আমি যা ইচ্ছে তাই করব। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।" পাসারেল্লার ওপর তাঁর রাগ ১৯৭৮ সাল থেকে। মেনোত্তি যখন বিশ্বকাপ টিম থেকে বাদ দেন, তখন পাসারেল্লা একবারও বলেননি, মারাদোনাকে টিমে রাখা উচিত। যাই হোক, এই ঘটনার পর অর্থাৎ মারাদোনার সঙ্গে ঝগড়া করার পর, পাসারেল্লা টিম থেকে বাদ পড়েন। তাঁর জায়গাটা নেন খোসে লুইস ব্রাউন।

স্পেনের বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার কথা মনে ছিল মারাদোনার। ফুটবলার-জীবনের খারাপ দিকটা তিনি আগেই দেখেছেন। ইউরোপে খেলতে গিয়ে তিনি অনেক পরিণত হয়ে যান। একে বিলার্ডোর মতো কোচ সহায়, তার ওপর সতীর্থরা সবাই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন। এই অবস্থায়, আরও একটা সুবিধে আর্জেন্টিনা সেবার আর ফেভারিট দল নয়। ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি আর ইতালির দিকেই সবার নজর। লোকের ধারণা ববি রবসনের ইংল্যান্ড দলও চ্যাম্পিয়ান হতে পারে। মেক্সিকোয় আর্জেন্টিনা দল যখন কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছল এবং ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হল—তখন ইউরোপের সাংবাদিকরা নড়েচড়ে বসলেন। তাঁদের মাথায় এল ফকল্যান্ড যুদ্ধের কথা। ইংল্যান্ডের 'ট্যাবলয়েড' কাগজগুলো অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে দিল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে।

একটা কাগজ লিখল, "মেক্সিকো সরকার পাঁচ হাজার সৈন্য

boierpathshala.blogspot.com

নামাচ্ছেন। আমরাও আসছি।" বুয়েনস আইরেসের কাগজগুলো জবাব দিল, "দস্যুরা, তোমাদের জব্দ করার জন্য আমরা লোক পাঠিয়েছি।" টেনশন তৈরি হয়ে গেল কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা ঘিরে। আর্জেন্টিনার বারাস ব্রাভাস দলের কথা আগেই লিখেছি। ওই দলের কয়েকজন বিমানে রওনা হয়ে গেলেন মেক্সিকো। তাঁরা বদলা নিতে চান। ফকল্যান্ড যুদ্ধে ব্রিটিশ সৈন্যরা যেসব আর্জেন্টিনীয়কে মেরেছিলেন, তাঁদের হয়ে শোধ তোলার জন্য। অনেকে বলেন, চার্টার্ড বিমানে বুয়েনস আইরেস থেকে বারাস ব্রাভাসদের নিয়ে যাওয়ার খরচ দিয়েছিলেন মারাদোনাই। ইউরোপে তিন বছর কাটানোর জন্য তিনি বুঝতে পারেন, সুদাকাসদের প্রতি তাচ্ছিল্য কতটা। মনে মনে তাই তিনি ইংল্যান্ডকে হারানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু নিজের মনের কথা সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করলেন না।

কয়েক সপ্তাহ আগে ওসি আর্দিলিসের বেনিফিট ম্যাচ খেলার জন্য মারাদোনা ইংল্যান্ড গিয়েছিলেন। আর্দিলিসের টিমে মারাদোনার পাশে সেই ম্যাচে খেলেন গ্লেন হডল। মারাদোনা চোট পাওয়ার ভয়ে জোর দিয়ে খেলেননি। কিন্তু হডলের স্কিল দেখে তিনি অবাক হয়ে যান। ইংলিশ ফুটবল সম্পর্কে তাঁর ধারণাই বদলে যায়। পরে তিনি জানতে পারেন টিভি-তে ব্রাজিলীয় ফুটবলারদের দেখে হডল টেকনিক শিখেছেন। হডল, প্লাট, গাসকয়েন সম্পর্কে মারাদোনা শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। মেক্সিকোয় তিনি বুঝতে পারেন, ইংল্যান্ড টিমকে হারানো সহজ হবে না। আজটেক স্টেডিয়ামে প্লেয়ার্স টানেলে দ্বিতীয়বার দেখা হল হডলের সঙ্গে মারাদোনার। ম্যাচ খেলতে নামার জন্য দু'দল তখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। মারাদোনা একবার চোখ মেরে হডলকে বুড়ো আঙুল দেখালেন। তা দেখে হডল হাসলেন। টেনশন কমে গেল।

এই ম্যাচ নিয়ে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় ছিলেন দু'জন। বিলার্ডো আর রবসন। দু'দলের কোচ। মেক্সিকোয় ব্রিটেন আর আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতরা গোপনে বৈঠক সেরে নিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনেই চাননি, একটা ফুটবল ম্যাচ নিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক আরও

boierpathshala.blogspot.com

খারাপ হোক। বিলার্ডোর কাছে ফোন এল দেশের রাষ্ট্রপতি রাউল আলফোনসিনের। তিনি নিষেধ করে দিলেন, রাজনৈতিক কথাবার্তা না বলতে। বিলার্ডো ফোন করে এই অনুরোধ করলেন ববি রবসনকে। কিন্তু রবসনের মাথায় তখন অন্য চিন্তা। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন বারাস ব্রাভাসদের। ম্যাচের ফল যাই হোক, শেষে যেন রক্তক্ষয়ী লড়াই না শুরু হয়ে যায় মেক্সিকোর রাস্তায় রাস্তায় দু'দলের সমর্থকের মধ্যে। রবসন যখন সমর্থকদের কথা ভাবছেন, বিলার্ডো তখন চিন্তা করছেন রেফারিং নিয়ে। রেফারির সামান্য একটা ভুল আজটেক স্টেডিয়ামে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে।

মেক্সিকোয় এই যে মারাদোনা ঝলমল করে উঠেছিলেন, তার অন্যতম কারণ চমৎকার 'রেফারিং'। বলপ্লেয়ারদের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর ছিল সেবার রেফারিদের। সামান্য ফাউল হলেই তাঁরা কার্ড দেখাচ্ছিলেন। রেফারিদের নিরাপত্তা পেয়ে মারাদোনা তাঁর জাদুর থলি থেকে অভিনব কৌশলগুলো একে-একে বের করে দেখাতে পারছিলেন। ১৯৮২ সালে মেনোত্তি তাঁকে একেবারে স্ট্রাইকার হিসেবে খেলান। যার ফলে ডিফেন্ডারদের 'মার্কিং' ছেড়ে বেরোতে পারেননি। মেক্সিকোতে বিলার্ডো তাঁকে ছেড়ে দেন, "যেমন ইচ্ছে খেলো।" এমন স্বাধীনতা পেয়ে মারাদোনার মতো ফুটবলাররা তো খুশি হবেনই। তাই ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডাররা নন, মারাদোনার মাথায় তখন গোলকিপার পিটার শিলটন। কাগজগুলোও লিখতে শুরু করেছিল, "আসলে এই ম্যাচে লড়াই মারাদোনা আর শিলটনের মধ্যে। ম্যাচেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে বড়।"

টান টান উত্তেজনার মধ্যে সেদিন ম্যাচ শুরু হল। প্রথমার্ধ গোলশূন্য। বিরতির পর ইংল্যান্ডের স্টিভ হজ তাড়াহুড়োয় শিলটনের দিকে লব করলেন একটা বল। মারাদোনাকে তিনি দেখতে পাননি। এমন পরিস্থিতি হল, গোল ছেড়ে বেরিয়ে এলেন শিলটন। তার তাঁর দিকে দৌড়ে গেলেন মারদোনা। দু'জনেই শূন্যে লাফালেন। মারাদোনা হেড দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে হাত লাগিয়ে গোলে পাঠালেন। এত দ্রুত কাজটা তিনি করলেন, তিউনিশিয়ান রেফারি তা ধরতেই পারলেন না। তিনি গোলের

boiserpathshala.blogspot.com

বাঁশি বাজিয়ে দিলেন। ইংল্যান্ডের প্লেয়াররা রেফারির কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানালেন। শিলটনের মতো ঠাণ্ডা মাথার লোকও ইঙ্গিতে দেখালেন, মারাদোনা গোলটা করেছেন হাত দিয়ে। কিন্তু তাতে কোনও কাজ হল না।

চার মিনিট পর আবার গোল। এবারও করলেন মারাদোনা। এই গোলটাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা গোল বলে চিহ্নিত করেছেন পরে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। নিজেদের অর্ধ থেকে বল ধরে মারাদোনা একের পর এক কাটিয়ে গেলেন গ্যারি স্টিভেনস, টেরি বুচার, ফেনউইক এবং শেষে ফের বুচারকে। তারপর শিলটনকে বোকা বানিয়ে বল ঠেলে দিলেন গোলে। শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ম্যাচটা জিতল ২-১ গোলে। মারাদোনার প্রথম গোলটা নিয়ে পরে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। ইউরোপের লোকেরা এই গেমসম্যানশিপ আশা করেননি মারাদোনার মতো ফুটবলারের কাছে। প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকরা মারাদোনাকে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রথম গোলটায় কি আপনার হাত ছিল?" মারাদোনা ঘুরিয়ে উত্তর দিলেন, "আমার নয়, ওতে ভগবানের হাত ছিল।"

চরম বিতর্কের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা দল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হল। ফাইনালে পশ্চিম জার্মানিকে ৩-২ গোলে হারিয়ে। লোকে তুলনা শুরু করল পেলের সঙ্গে মারাদোনার। আর্জেন্টিনার মানুষদের এখনও দৃঢ় বিশ্বাস, মারাদোনা বড়। অনেক যুক্তি তাঁরা দেন মারাদোনার হয়ে। বিশ্বকাপ ফুটবলে গিয়ে আমি নিজেও এই প্রসঙ্গ নিয়ে তর্কাতর্কি শুনেছি দু'দেশের সাংবাদিকদের মুখে। আর্জেন্টিনার মানুষদের এমনিতেই ধৈর্য বস্তুটা কম। তাঁরা চট করে রেগে যান। চট করে ঠাণ্ডা হয়ে যান। সের্জেই লেভেনস্কির মতো ভদ্র ছেলেকেও দেখেছি, মারাদোনার ব্যাপারে খেপে যেতে। পরে শুনলাম, আর্জেন্টিনীয়রা চায়ের মতো এক ধরনের পানীয় খান। তার নাম 'মাতে'। খুব কড়া ধরনের পানীয়। খেলে স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ধৈর্যহীনতার এটাও একটা কারণ হতে পারে।

পেলে এবং মারাদোনা দু'জনকেই কাছ থেকে দেখেছি। পেলের আসল নাম এডসন আরান্তেস দো নাসিমেন্তো।

boierpathshala.blogspot.com

মারাদোনার মতো তিনিও অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ব্রাজিলের মিনাস গেরিয়াস নামে একটা প্রদেশ আছে। আর ত্রেস কারাকোয়েস নামে ছোট্ট একটা শহরে পেলের জন্ম। ১৯৪০ সালের ২৩ অক্টোবর। পর্তুগিজে বস্তি অঞ্চলকে বলে পাভেলাস। সেখানেই ছ'বছর কাটাতে হয়েছে পেলেকে। এই অংশটুকুতে মারাদোনার সঙ্গে মিল আছে পেলের ছেলেবেলার। পেলে ফুটবল শিখেছেন রাস্তায়, বাতিল জমিতে, যাকে পর্তুগিজে বলা হয় পেলাডাস। সেই থেকে নাম হয়ে যায় পেলে। ত্রেস কারাকোয়েস থেকে পেলের বাবা চাকরির জন্য চলে যান বাউরু বলে একটা শহরে।

মারাদোনাকে যেমন তুলে ধরেন কর্নেখো, পেলেকেও তেমনই আবিষ্কার করেন ওয়ালডার্মার দে ব্রিটো। ১৯৩৮ সালের ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দলের সদস্য। ব্রিটো চাকরি করতেন বাউরুর পুরসভা দফতরে। কাজটা তাঁর ভাল লাগছিল না। তিনি মনেপ্রাণে চাইছিলেন সাও পাওলোর মতো বড় শহরে। তা পেলের মতো প্রতিভা হাতে পেয়ে ব্রিটো যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। তাঁর মনে আশা জাগল, পেলেকে দেখিয়েই অদূর ভবিষ্যতে তিনি সাও পাওলোয় গিয়ে থাকতে পারবেন। খুব অল্পদিনের মধ্যেই পেলের নাম ছড়িয়ে পড়ল। রিও ডি জেনিরো, সাও পাওলোর ক্লাবগুলো আগ্রহ দেখাল। রিও-র বাঙ্গু ক্লাব পেলেকে সই করাতে এলে তাঁর মা কিন্তু বেঁকে বসলেন। না, অত বড় শহরে ছেলেকে পাঠাবেন না। সাও পাওলো প্রদেশে স্যান্টোস নামে একটা শহর আছে। সেখানকার স্যান্টোস ক্লাব সাও পাওলো লিগের টিম। তারা এলে পেলের মা অবশ্য না করলেন না। পেলের বয়স তখন মাত্র ১৫। সেই থেকে স্যান্টোস ক্লাবের নামটা পেলের সঙ্গে জুড়ে গেল।

পেলে ফুটবলার জীবনে আর কোনও ক্লাবে খেলেননি। ১৯৭৭ সালে অবসর নেওয়ার পর অবশ্য নিউ ইয়র্কের কসমস ক্লাবে যান। তবে সেটা যত না রোজগারের জন্য, তার চেয়েও বেশি আমেরিকায় ফুটবল-প্রচারের জন্য। অন্য দিকে, মারাদোনা একের পর এক ক্লাব বদলেছেন। প্রথমে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স,

boierpathshala.blogspot.com

তারপর বোকা জুনিয়র্স, বার্সেলোনা ক্লাব, নাপোলি ক্লাব, সেভিয়া ক্লাব, নেওয়েল ওল্ড বয়েজ ক্লাব। অর্থের পেছনে মারাদোনা এমন দৌড়েছেন, এক সময় তাঁর নামই হয়ে যায় 'মারাডলার'। মারাদোনা প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন ১৫ বছর বয়সে। পেলে বিশ্বকাপই খেলে ফেলেন ১৭ বছর বয়সে। দু'জনেই চারবার করে বিশ্বকাপ খেলেছেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ান হওয়ার ব্যাপারে পেলে কয়েক মাইল এগিয়ে। পেলে তিনবার বিশ্বকাপ জেতেন। মারাদোনা মাত্র একবার। এই পরিসংখ্যান দিয়েই নয়, ব্রাজিলের মানুষ আরও দু'টি যুক্তি দেন পেলের শ্রেষ্ঠত্বের। দুই কিংবদন্তি ফুটবলারই প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন টানা ২০ বছর। কিন্তু ম্যাচ এবং গোলের সংখ্যায় পেলে অনেক এগিয়ে। পেলে ১২৫৪টা প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন। গোল করেছেন হাজারেরও বেশি। সেখানে মারাদোনা খেলেছেন মাত্র ৬৯২টা ম্যাচ। তাঁর গোল ৩৫৪টি।

দু'জনের উনিশ-বিশ গড়ন। পেটাই শরীর। দু'জনেই ট্যাক্‌ল সামলাতে দক্ষ। দু'পা সমান চালাতে পারদর্শী। যদিও পেলে স্বচ্ছন্দ ছিলেন ডান পায়ের ব্যবহারে এবং মারাদোনা বাঁ পায়ে। দু'জনেই প্রচণ্ড গতিতে দৌড়তে পারতেন। বল নিয়ে দৌড়নোর সময় গতির হেরফের করে ধোঁকা দিতে পারতেন। মাঠে দু'জনেই বল নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করে দেখাতে অভ্যস্ত ছিলেন। মারাদোনা হচ্ছেন 'গামবেটা' (সর্পিল দৌড়ে দক্ষ)। আর পেলে 'মালান্দ্রো' (পর্তুগিজে মালান্দ্রো হলেন কিংবদন্তির জাদুকর, যিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী)। দু'জনেই ক্যাথলিক। পোপের স্নেহধন্য। দু'জনেই ইউনিসেফ আর তাঁদের দেশের দূত।

দু'জনের মধ্যে আরও মিল আছে। পেলেও মাঠে সব সময় ভদ্র আচরণ করেননি। মারাদোনা লাল কার্ড দেখলে সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে। পেলেও কিন্তু কমবার মাঠের বাইরে যাননি। পার্থক্য হল, টিভি-র দৌলতে মারাদোনার লাল কার্ড যত লোকের কাছে ধিককৃত হয়েছে, পেলের সময় ততটা হয়নি। ব্রাজিলের খবর তখন ইউরোপে তেমনভাবে আসেনি। স্যাটেলাইট বিপ্লব তখনও এতটা হয়নি। মারাদোনার আমলে

boierpathshala.blogspot.com

ইউরোপের লোক ঘরে বসে দেখার সুযোগ পেয়েছেন, বোকা জুনিয়র্স কেমন খেলছে। পেলের আমলে তা দেখার সুযোগ পেতেন না। ফলে পেলেরা যখন বিশ্বকাপে খেলার জন্য আসতেন, তখন বিস্ময়কর উপাদান সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এখনকার ফুটবলে কিছু লুকোচাপা রাখার উপায় নেই। কোচেরা টিভি সেটের সামনে বসে গিয়ে, প্লেয়ারদের ভাল-মন্দ সব টুকে নিতে পারছেন। প্রস্তুত থাকছেন তা মোকাবিলা করার জন্য। তাই মারাদোনার আমলে ঝলমল করে ওঠা কঠিন।

খেলার সময় বদমেজাজ দেখানোর ব্যাপারে দু'জনেই সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। পেলেও অনেক সময় তেড়ে গিয়েছেন রেফারির দিকে। নেশনস কাপে একবার তিনি আর্জেন্টিনার এক প্লেয়ারের নাক ফাটিয়ে দেন। এই কাজটা যখনই মারাদোনা করেছেন, তখন নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে। এই কারণেও মারাদোনার রাগ পেলে-র ওপর। ১৯৮২ সালে পেলে একবার অনাবশ্যক মারাদোনাকে চটালেন। এই বলে যে, "ডিয়েগোর মধ্যে মানবিক গুণাবলীর অভাব আছে।" তখন মারাদোনাও সরাসরি আক্রমণ করলেন, "পেলে নিজে কী ? বউকে ছেড়েছে। মেয়েকে অস্বীকার করেছে। ও মানুষ ? আমি তো তবু সারাজীবন পরিবার নিয়ে আছি। মা-বাবা সবাইকে নিয়ে। আমার চেয়ে ও বড় মানুষ হল ?" বিদ্রোহী মারাদোনার আসল চেহারাটা তখনই প্রকাশ পেয়েছিল। পেলের মতো ফুটবলারকেও রেয়াত করেননি।

দু'জনকে দেখে আমার মনে হয়েছে, একই পরিবেশ থেকে উঠে এলেও পেলে নিজেকে পরে অনেক ঘষামাজা করেছেন। খেলা ছাড়ার পর কয়েকবার ব্যক্তিগত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়লেও ফুটবলমহলে তাঁর ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রেখেছেন। অবসর নেওয়ার পর তিনি ডিগ্রি নিয়েছেন। সফল ব্যবসায়ী হয়েছেন। কিন্তু সারা বিশ্ব জয় করার পরও মারাদোনা সেই একই রকম রয়ে গেলেন। উপজাতিদের মতো দলবদ্ধ থাকার মানসিকতা আর বদলাতে পারলেন না। তাঁর চারপাশ ঘিরে এখন আত্মীয়স্বজন, ছোটবেলার বন্ধুরা। দেখে প্রশ্ন জাগত, মারাদোনা কি এক ধরনের

boierpathshala.blogspot.com

হীনম্মন্যতায় ভোগেন ? মাদক নেওয়ার জন্য বারবার সাসপেন্ড হয়ে তিনি নিজের ভাবমূর্তি একেবারে শূন্যে নামিয়ে এনেছেন। পেলে অনেক অভিজাত। আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে আধ ঘণ্টা কথা বলে যেতে পারবেন। কিন্তু হোয়াইট হাউসে যদি মারাদোনাকে ডাকা হয়, তিনি হয়তো যাবেনই না। উলটে বলবেন, "ক্লিন্টনকে বুয়েনস আইরেসে আসতে বলুন।" এই মারাদোনাই হয়তো দশবার বিনা নিমন্ত্রণে দৌড়ে যাবেন কিউবায়। গিয়ে কথা বলে আসবেন ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে।

॥ ৮ ॥

বড় মাপের কোনও অনুষ্ঠানে, নামী লোকজনের মাঝখানে মারাদোনা বরাবরই অস্বস্তি অনুভব করেছেন। একবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেওয়ার জন্য ডাকা হল তাঁকে। উদ্যোগটা নেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া এক আর্জেন্টিনীয় ছাত্র। মারাদোনা রাজি হয়ে গেলেন। এমন একটা সময়ে, যখন হাত দিয়ে গোল করার জন্য ইংরেজরা তাঁর নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারছেন না। পেলে হলে, এই ধরনের অনুষ্ঠানে তাঁর ব্যক্তিত্বেই মন জয় করে নিতেন ছাত্রদের। মারাদোনা নিজে তাঁর লিখিত ভাষণ পড়ার সময় বারবার হোঁচট খেয়ে কৌতুকের খোরাক হয়ে উঠলেন। প্রচণ্ড নার্ভাস।

ফকল্যান্ড যুদ্ধের কারণে মারাদোনা সারাজীবন ইংরেজদের অপছন্দ করে এসেছেন। হয়তো এই ধারণা নিয়ে যান, ইংরেজ ছাত্ররা তাঁকে অপদস্থ করবেন নানা প্রশ্ন করে। কোনওরকমে ভাষণ শেষ করেই তিনি বেরিয়ে এলেন বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য। অনুষ্ঠানে দেরি হয়ে গিয়েছিল। বিমান ছাড়তে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। আর্জেন্টিনীয় ছাত্রটি তাঁকে বললেন, "প্লেন যদি ধরতে চান, তা হলে টিউব রেলে চলুন। অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।" কিন্তু মারাদোনা ভয় পাচ্ছিলেন। টিউব রেলে যাত্রীরা যদি চিনে ফেলেন তা হলে তাঁকে হেনস্থাও করতে

boierpathshala.blogspot.com

পারেন। তবুও কী ভেবে তিনি রাজি হয়ে গেলেন। গলাবন্ধ কোট, মুখ-কান ঢাকা টুপি—এক নজরে চেনা সম্ভব নয় মারাদোনাকে। টিউব রেলেই তিনি রওনা হলেন এয়ারপোর্টের দিকে।

চার-পাঁচটা স্টেশন বাকি থাকতে, হঠাৎ এক যাত্রী আবিষ্কার করলেন, ডিয়েগো মারাদোনা তাঁদের সঙ্গে টিউব রেলে যাচ্ছেন। তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেই কামরায় গুঞ্জন। ধরা পড়ে গেলেন মারাদোনা। ভাবলেন, আর রক্ষা নেই। এবার ইংরেজরা তাঁকে বোধ হয় ছিঁড়ে খাবেন। কিন্তু হল উলটোটা। কেউ হ্যান্ডশেক করে গেলেন। কেউ অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিলেন। সেদিন যাত্রীদের ওইরকম ব্যবহারে মারাদোনা অভিভূত। টটেনহ্যাম হটস্পার ক্লাব একবার তাঁকে নিতে চেয়েছিল। তখন ইংরেজদের ওপর রাগেই মারাদোনা ওই ক্লাবে যাননি। কিন্তু ইংরেজদের ফুটবলপ্রীতি দেখে তিনি মোহিত হয়ে গেলেন। ওই ঘটনার পর আর কখনও ইংল্যান্ডের ফুটবল নিয়ে মারাদোনা তাচ্ছিল্যসূচক কথা বলেননি।

১৯৮৬-'৮৭ সাল দুটি মারাদোনার জীবনের সেরা বছর। মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ জেতার পরের বছরই ইতালিতে 'স্কুডেত্তো'-র খেতাব জয়। খ্যাতির মধ্যগগনে। স্কুডেত্তো হল ইতালির ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ। নাপোলিকে এই লিগ দেওয়া নিয়ে সারাজীবন গর্ব করে গেছেন মারাদোনা। একবার পেলেকে কোনও এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, "মারাদোনাকে কি আপনি আপনার সমকক্ষ মনে করেন?" পেলে বোধ হয় একটু খারাপ মেজাজে ছিলেন। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "আগে ওকে আর-একবার জন্ম নিয়ে, ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপ জিততে বলুন আমার মতো। তারপর আমি ওকে আমার সমকক্ষ বলে ভাবব।" এই কথাটা খবরের কাগজে বেরোবার পর, মারাদোনার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন সাংবাদিকরা। মারাদোনা বললেন, "প্রশ্নটা আগে উলটো দিক থেকে করুন, তা হলে উত্তর দেব।" সাংবাদিকরা বললেন, "পেলেকে কি আপনি আপনার সমকক্ষ বলে মনে করেন?" তখন মারাদোনা উত্তর দিলেন, "আগে ওকে আর-বার জন্ম নিয়ে,

boierpathshala.blogspot.com

ইতালিতে এসে, নাপোলির মতো ছোট ক্লাবে খেলে, লিগ চ্যাম্পিয়ান হতে বলুন। তারপর ভাবব, ও আমার সমকক্ষ কি না।”

অন্য কেউ হলে এই ধরনের মন্তব্য করতেন না। কিন্তু মারাদোনা অন্য ধাতুতে গড়া। বিদ্রোহী। তিনি পেলে-র মতো লোককেও গুরুত্ব দেন না। আন্তর্জাতিক ফুটবল কভার করতে গিয়ে নানা সময় দেখেছি, দু'জন বড় ফুটবলার একে অন্যের মুখোমুখি হলেই পারস্পরিক শ্রদ্ধা দেখাতে ভোলেন না। পেলে যখন বেকেনবাওয়ার বা ববি চার্লটনের সঙ্গে একই মঞ্চে বসেন, ইউসেবিও যখন যোহান ক্রুয়েফের মুখোমুখি হন, তখন শিষ্টাচারের বন্যা বয়ে যায়। মনের ভেতর তাঁদের যা-ই ধারণা থাকুক না কেন। কিন্তু মারাদোনা এই সৌজন্য প্রকাশের ধারেকাছে নেই। তিনি মনের ভাব লুকিয়ে রাখতে জানেন না। বড় ফুটবলারদের কেউ তাঁর বন্ধু নন। একমাত্র ফ্রান্সের এরিক কতোঁনা ছাড়া। সেই কতোঁনা, বিতর্কে যিনি মারাদোনাকেও ছাপিয়ে গেছেন।

আগেই লিখেছি, মারাদোনাকে সারাজীবন তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তাঁর আবেগ। কারও সঙ্গেই তিনি বেশিদিন সুসম্পর্ক রাখতে পারেননি। নাপোলির লোকজন তাঁকে একটা সময় মাথায় করে রেখেছিলেন। তাঁরাও একটা সময় মারাত্মক খেপে গেলেন। নাপোলি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফার্লাইনো আদর করে নিয়ে এসেছিলেন মারাদোনাকে। তাঁর কোনও আবদার মানতে বাকি রাখেননি। সেই ফার্লাইনোকেই মারাদোনা চটালেন প্রথমে লিগ খেতাব জেতার পর। বার্সেলোনা থেকে যখন তিনি ইতালিতে আসেন, তখন নাপোলি ক্লাবের সদস্যসংখ্যা ছিল ২৫ হাজারের মতো। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই সেই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ হাজারে। নাপোলি ক্লাবের আয় অনেক বাড়িয়ে দেন মারাদোনা। নাপোলি ক্লাবের সঙ্গে তিনি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে যাবেন, মিনিটে দু'হাজার ডলার (প্রায় আশি হাজার টাকা)।

৬০ বছর পর নাপোলি লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় মারাদোনার খ্যাতি তখন আকাশ-ছোঁয়া। তিনিই নাপোলির রাজা। যেদিন লিগের শেষ খেলা, তার দু'দিন আগে মারাদোনা বললেন,

boierpathshala.blogspot.com

"নাপোলির মানুষ এক মিনিট উৎসব করলে আমি খুশি হব না। উৎসবটা এক ঘণ্টা ধরে করা চাই।" ব্যস, এ-কথা শোনার পর নাপোলির মানুষ খেপে গেলেন। সান পাবলো স্টেডিয়ামে খেলা দেখার জন্য তাঁরা পাগল হয়ে গেলেন। চার হাজার টাকা দামের টিকিটের দাম এক লাফে বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৪০ হাজার টাকায়। সেদিন নাপোলির মানুষ একটা কেক উপহার দেন মারাদোনাকে। আড়াই ফুট উঁচু। ১০ কেজি চকোলেট দিয়ে তৈরি। কেকটা মারাদোনার আদলে গড়া। নাপোলি ক্লাবের প্রচণ্ড রাগ তখন এ সি মিলানের ওপর। সেই রাতে সমর্থকরা মিলানের শোকযাত্রায়ও অংশ নিলেন। এটা বাড়াবাড়ি মনে হল ফার্লাইনোর। তিনি বুঝতে পারলেন, মারাদোনাকে একটু নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার। ফার্লাইনো হলেন সেই ধরনের ফুটবল-কর্তা, যাঁরা মনে করেন, ফুটবলাররা ক্লাবের চাকুরে। তাঁদের বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি মারাদোনাকে আটকাতে গেলেন। এবং মারাত্মক ভুল করে ফেললেন।

নাপোলি লিগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার আগে জন্ম হয় ডালমার। মারাদোনার বড় মেয়ের। তাকে দেখার জন্য মারাদোনা মাঝে-মাঝেই উড়ে যেতেন বুয়েনস আইরেসে। গিয়ে প্রতিবার ফিরতেন দু-চারদিন দেরি করে। প্র্যাকটিস সূচিতে অসুবিধে হত। কোনও-কোনও ম্যাচে খেলতেও পারতেন না। এ নিয়ে কোচ অ্যারিগো সাক্কির সঙ্গে প্রথমে তাঁর লাগল। সাক্কি তাঁকে সাসপেন্ড করলেন। এই সাক্কি খুব কড়া ধাতের মানুষ। পরে তিনি ইতালির জাতীয় দলের কোচও হন। সাসপেনশনের খবর শুনে মারাদোনা তড়িঘড়ি ফিরে এলেন নাপোলিতে। ফার্লাইনোকে বললেন, "আপনারা কী ভেবেছেন ? আমার মেয়ের চেয়েও আমার কাছে ফুটবল বড় ? কখনওই না।" ফার্লাইনো ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি এসব আবেগের ধার ধারেন না। তাই সাসপেনশন তুলে নিলেন না। মারাদোনা যেমন ক্লাবকে টাকা এনে দিয়েছেন, তেমনই প্রচুর খরচ করিয়েও দিচ্ছেন। বিমানের প্রথম শ্রেণীতে বারবার যাতায়াতের খরচ কি কম ? এই বিলাসিতা প্রশ্রয় দিলে ক্লাবে একদিন লাল বাতি জ্বলবে। তিনি অন্য

boierpathshala.blogspot.com

ডিরেক্টরদের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না।

ক্লাবের সঙ্গে আরও একটা ব্যাপারে মনোমালিন্য শুরু হল মারাদোনার, ডাক্তার নিয়ে। নাপোলির নিজস্ব ডাক্তারদের একটা দল ছিল। যাঁরা প্লেয়ারদের চোট-আঘাত সারাতেন। কিন্তু তাঁদের কোনও পরামর্শই নিতেন না মারাদোনা। তাঁর পছন্দ সেই ডাঃ রুবেন অলিভা। কোনও ম্যাচে মারাদোনা চোট পেলেই ডাক পড়ত ডাঃ অলিভা-র। মিলান থেকে প্লেনে তিনি আসতেন। নিজের ইচ্ছেমতো ক্লাবের খরচে থাকতেন। এই বাড়তি খরচটা সহ্য করতে পারছিলেন না ফার্লাইনো। এই একই কারণে বার্সেলোনা ক্লাবের সঙ্গে প্রচণ্ড অশান্তি হয়েছিল মারাদোনার। যার পরিণতিতে তাঁকে বার্সেলোনা ছাড়তে হয়। ডাঃ অলিভা-র ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর তো বটেই, এমনকী তাঁর মায়েরও। তোতা একবার নাকি বলেছিলেন, "ডিয়েগোকে আমি নাপোলিতে দিয়েছি। তার বড় একটা কারণ, ডাঃ অলিভা। কেননা ডিয়েগো তা হলে ডাঃ অলিভার কাছাকাছি থাকবে।" তা, ডাক্তার নিজের লোক হওয়ায় মারাদোনা তাঁর ইচ্ছেমতো ম্যাচে খেলতেন অথবা বসে থাকতেন। ডাঃ অলিভা সার্টিফিকেট দিতেন ক্লাবকে। আর তা বাধ্য হয়ে মানতে হত সাক্কিকে।

ক্লাউদিয়া যখন বুয়েনস আইরেসে, তখন মাফিয়াদের সঙ্গে মেলামেশা প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিতেন মারাদোনা। মাদক সেবন করতেন। তাঁর ম্যানেজার কপোলা সব জেনেশুনেও মুখ বুজে থাকতেন। অনেকে আবার বলতেন, কপোলাই এই সর্বনাশা নেশা ধরিয়েছিলেন মারাদোনাকে। কিন্তু এটা সত্যি নয়। বার্সেলোনা থাকার সময়ই মারাদোনা কোকেনে অভ্যস্ত হয়ে যান। অনেকে বলেন, মারাদোনার এই মাদকাসক্তির পেছনে অন্য কারণ ছিল। এটা গভীর ষড়যন্ত্র। ইতালিতে রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন মারাদোনা। উত্তর ইতালি আর দক্ষিণ ইতালির মধ্যে তখন প্রচণ্ড ঝগড়া। মিলান, তুরিন, ভেনিস, এইসব অঞ্চলের লোকেরা দক্ষিণের বাসিন্দাদের তখন মানুষ বলেই মনে করতেন না। তাঁদের ধারণা, সিসিলি নাপোলির লোকেরা ভদ্রলোক নন। তাঁদের সৃষ্টি বলে কিছু নেই। সবাই মাফিয়া। এইরকম একটা

boierpathshala.blogspot.com

অঞ্চলের ক্লাব লিগ চ্যাম্পিয়ান হচ্ছে, এটা তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তাই রাগ গিয়ে পড়ছিল মারাদোনার ওপর। যে করেই হোক, লোকটাকে বিদায় করো। অনেকের ধারণা, উত্তরের কিছু ক্ষমতাশালী লোক, মারাদোনার চারপাশে কিছু মতলববাজ লোক ভিড়িয়ে দেন। এঁরাই মারাদোনাকে কোকেন ধরিয়েছেন।

যাঁদের ষড়যন্ত্র হোক, মারাদোনা কিন্তু ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন তিনি মাদকাসক্ত। কথাবার্তা, আচার-আচরণে সামঞ্জস্য থাকছিল না। মাঝেমধ্যে খেলার মাঠেও ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন। পিসা ক্লাবের বিরুদ্ধে একটা ম্যাচে মারাদোনা এত বাজে খেললেন, তাঁকে সাক্কি তুলে নিতে বাধ্য হলেন। এই অপমানে মারাদোনা আর রিজার্ভ বেঞ্চে না বসে সোজা চলে গেলেন ড্রেসিংরুমে। সেদিন প্রেসিডেন্টের বক্সে বসে খেলা দেখছিলেন ক্লাউদিয়া, সদ্যোজাত ডালমাকে নিয়ে। তাঁকেও নাপোলির সমর্থকরা যা-তা বললেন। পরে তা শুনে মারাদোনা এমন রাগলেন, সোজা ফিরে গেলেন বুয়েনস আইরেসে। যাওয়ার সময় বলে গেলেন, নাপোলির সঙ্গে আর কোনও সম্পর্কই রাখবেন না। যে-ক্লাবের সমর্থকরা তাঁর মেয়েকেও গালাগালি দেয়, সেই ক্লাব বিশ্বের নিকৃষ্ট ক্লাব।

কিন্তু ফুটবল না-খেলে মারাদোনা বাঁচবেন কী করে? কিছুদিন পর তিনি ফের ফিরে এলেন। এসেই ক্লাবের সঙ্গে সন্ধি করে ফেললেন। সম্ভবত তাঁকে এই পরামর্শটা দেন কার্লোস বিলার্ডো। তখন উয়েফা কাপের খেলা চলছে। ইতালিতে বিশ্বকাপেরও খুব বেশিদিন দেরি নেই। বিলার্ডো দেখলেন, মারাদোনা যদি ইতালির লোকজনদের এইভাবে চটাতে থাকেন, তা হলে বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা টিম কোনও সমর্থনই পাবে না। তাই মারাদোনাকে তিনি বোঝালেন। অনর্থক জেদাজেদি করার থেকে বিশ্বকাপের খেতাব রক্ষাটা অনেক বেশি জরুরি। নাপোলিতে ফিরে আসার পরই মারাদোনা অন্য মানুষ। পার্টিতে যাওয়া ছেড়ে দিলেন। মন দিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। ফার্লাইনো যা বলেন, শোনেন। পুরো টিম মারাদোনাকে ঘিরে জেগে উঠল। উয়েফা কাপে একের পর এক ম্যাচ নাপোলি জিততে থাকল। শেষ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়ানও হয়ে গেল।

boierpathshala.blogspot.com

সেই রাতে মারাদোনা আবার সেই পুরনো মেজাজে। খেলার পর নাপোলির সান পাবলো স্টেডিয়ামে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন, "বিশ্ব-ফুটবলে সবচেয়ে বড় স্টার কে?" মারাদোনা সকৌতুকে বললেন, "কোন তারকার কথা বলছেন? যে সাইজে বড়, না যে সবসময় জ্বলজ্বল করে।" কারও বুঝতে বাকি রইল না, সাইজে বড় বলতে মারাদোনা পেলেকে বোঝাচ্ছেন। প্রেস কনফারেন্স থেকে সেদিন মারাদোনা ফুর্তি করতে বেরোলেন। ভোর চারটে পর্যন্ত খানাপিনা সেরে, দলবল নিয়ে তিনি নাপোলির রাস্তায় নাচতে নামলেন। "নাপোলি আমার প্রিয় শহর। নাপোলির আমি রাজা।" রাস্তার পাশে, বাড়ির এক বৃদ্ধার ঘুম চটকে গিয়েছিল হই-হট্টগোলে। তিনি জানলা দিয়ে চিৎকার করে বললেন, "কী হচ্ছে এসব। কে তুমি, আমাদের বিরক্ত করছ?"

মারাদোনা তখন ঘোরের মধ্যে। তিনি জানলার পাশে এসে সুর করে বললেন, "আমি... আমি মা...রা...দো...না...আ...আ...।"

ভদ্রমহিলার বিরক্তি মুহূর্তে উধাও। রাস্তায় নেমে তিনি আদর করে গেলেন মারাদোনাকে, "আমাদের সোনার ছেলে।"

খুব ছেলেবেলায় একটা টিভি অনুষ্ঠানে একজন মারাদোনাকে প্রশ্ন করেন, "তোমার জীবনের স্বপ্ন কী?" ছোট্ট মারাদোনা তখন উত্তর দেন, "আর্জেন্টিনার লিগ জেতা আর বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান হওয়া।" দুটো স্বপ্নই পূরণ হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে যুক্ত হল উয়েফা কাপ। আর কী চাই জীবনে? টাকার অভাব নেই। নাপোলির সঙ্গে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চুক্তি। মাসে ১৫ লক্ষ ডলার। ইতালি এবং আর্জেন্টিনার দুটি টিভি চ্যানেলে তখন মারাদোনা অনুষ্ঠান করছেন। তাতেও প্রচুর টাকা। চ্যানেল-১০ প্রতি রবিবার একটা অনুষ্ঠান করত, 'সুপারস্টার স্পোর্টস টেল'। সারা সপ্তাহে বিভিন্ন কাগজের সাংবাদিকরা মারাদোনা সম্পর্কে যেসব সমালোচনা করতেন, ওই অনুষ্ঠানে তার উত্তর দিতেন মারাদোনা। এক-একদিন এক-একটা বোমা ফাটাতেন। এই অনুষ্ঠানটা খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকরা খুব দমে গেলেন। লিখতে ভয় পেতেন। কিন্তু মনেপ্রাণে তাঁরা চটে রইলেন মারাদোনার ওপর।

boierpathshala.blogspot.com

১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে ফের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করল মারাদোনার সঙ্গে ইতালিয়ানদের। তার কিছুদিন আগে রোমে বিশ্বকাপের খেলার সূচি তৈরি হয়েছিল। বুয়েনস আইরেসে বসে মারাদোনা বলে দিলেন, "খেলার সূচিতে কারচুপি করা হয়েছে। ইতালিকে সহজ গ্রুপ দিয়েছে ফিফা।" বলার কোনও দরকার ছিল না। কিন্তু মারাদোনা কোনও কথা চেপে রাখতে পারেন না। সরাসরি বলে ফেলেন। ইতালির বিরুদ্ধে বলে তিনি ফিফাকে তো চটালেনই, তার সঙ্গে ইতালির ফুটবল-কর্তাদের। কেননা, তাঁরাই খেলার সূচি অনুষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন। ফিফার প্রেসিডেন্ট জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ বললেন, "মারাদোনা স্টুপিড।"

উত্তরে পরদিন মারাদোনা উত্তর দিলেন, "যে লোকটা জীবনে ফুটবল খেলেনি সে ফিফার প্রেসিডেন্ট হয় কী করে?" সত্যিই, ব্রাজিলের লোক হয়েও হ্যাভেলাঞ্জ জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। তিনি ওয়াটারপোলো খেলতেন। ব্রাজিলের হয়ে তিনি ওলিম্পিকেও অংশ নিয়েছিলেন।

মারাদোনা ফের নাপোলি ক্লাবের প্র্যাকটিসে কামাই শুরু করলেন। যখন-তখন বুয়েনস আইরেসে চলে যান। তখন ছোট মেয়ে খিয়ানিনি জন্মেছে। দুই মেয়ের দুধের দাঁত দিয়ে তিনি কানের দুল বানিয়েছেন। হিরে-মুক্তো দিয়ে নয় কেন? মারাদোনা বলেছেন, সবসময় অনুভব করার জন্য যে তাঁর মেয়েরা সঙ্গে আছে। নাপোলির সঙ্গে বিরোধ মেটানোর জন্য এই সময় উদ্যোগ নিলেন সেই বিলার্ডো। প্র্যাকটিসে কামাইয়ের জন্য ফার্লাইনো উকিলের চিঠি পাঠিয়েছেন শুনে তিনি লিখলেন, জাতীয় বিশ্বকাপ দলের প্রস্তুতির জন্য মারাদোনাকে তিনিই আটকে রেখেছেন। মারাদোনার কোনও দোষ নেই। পেশাদার ফুটবলে জাতীয় দলের জন্য ক্লাব ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকে। তাই ফার্লাইনো কিছুই করতে পারলেন না। উকিলের চিঠি ফিরিয়ে নিলেন।

এইসব চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যেই মারাদোনা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলেন ক্লাউদিয়াকে। ওই বিয়েতে কত খরচ হয়েছিল কেউ জানেন না। নিমন্ত্রণের কার্ড তৈরি হয়েছিল ইতালিতে। মূল অনুষ্ঠান বুয়েনস আইরেসের লুনা পার্কে। সেট ডিজাইনার

boierpathshala.blogspot.com

মিওয়েল এর্নেন্ডোকে দায়িত্ব দেওয়া হল পার্কের ভোল পালটে দিতে। মারাদোনা ১৫০০ লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। বার্সেলোনা আর ইতালি থেকে লোক আনার জন্য আলাদা বিমান ভাড়া করে ফেললেন। কাউকেই কম খাতির করলেন না। বিয়ের অনুষ্ঠানে কার্ড বিলি, ফ্যাক্স মারফত চিঠি আদান-প্রদানের জন্যই মারাদোনা লাগালেন ২০০ জনকে। সেইসঙ্গে প্রচুর দোভাষীকেও। বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে বুয়েনস আইরেসে এলেন মিলান, জুভেন্তাস টিমের কর্তারা। এঁদের দু' চোখে দেখতে পারতেন না মারাদোনা। তা সত্ত্বেও কেন নিমন্ত্রণ করলেন তা নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা হয়েছে। আসলে বিশ্বকাপের আগে এঁদের একটু খুশি করতে চেয়েছিলেন মারাদোনা।

ক্লাউদিয়া যে-পোশাকটা পরে চার্চে যান, তার দাম পড়েছিল ১২ লক্ষ টাকা। তাতে মুক্তো, হিরে বসানো ছিল। পোশাকটার ওজনই দাঁড়ায় ১৫ কেজি। রোলস রয়েসে চেপে মারাদোনা চার্চে বিয়ে করতে গেলেন। সঙ্গে নিত-কনে নিজেরই দুই মেয়ে। বাবার বিয়েতে মেয়েরাও আনন্দ করল। বিয়ের কেক পাঠান ক্লাউদিয়ার বন্ধুরা। পাঁচ ফুট উঁচু সেই কেক। সন্ধ্যায় ডিনারে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা। খাওয়াদাওয়া শুরু হয়েছিল সন্ধেবেলায়। শেষ হল পরদিন দুপুরে ইতালির পিৎজা দিয়ে। এমন জাঁকজমকের বিয়ে পৃথিবীতে খুব কমই হয়েছে। ইতালি আর বার্সেলোনা থেকে উপহার আনার জন্য বারবার বিমান যাতায়াত করেছিল। তাতে প্রচুর খরচ হয়ে যায় নাপোলি ক্লাবের। খরচের বহর দেখে সেই রাতে মাথায় হাত ফার্লাইনোর। নাপোলির এক কর্তা বলেই ফেলেছিলেন, "ভালই তো ছিল ডিয়েগো। বিয়ে করতে গেল কেন ? আমরা যে পথে বসে গেলাম।" নাপোলির যাই হোক, বিয়ে করে মারাদোনা কিন্তু খুশি করে দিলেন বুয়েনস আইরেসের মানুষদের। তাঁরা উচ্ছ্বসিত। মুক্তকণ্ঠে তাঁরা বলতে শুরু করলেন, "ডিয়েগো লা পিবে ওর ওরে," মানে, "ডিয়েগো আমাদের সোনার ছেলে।"

সারা আর্জেন্টিনার শুভেচ্ছা নিয়ে ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপ অভিযানে ইতালিতে গেলেন মারাদোনা। ওই সময়ই প্রথম তাঁকে

boierpathshala.blogspot.com

আমি দেখি। রোমে যেদিন প্রথম নামি, সেদিনের অভিজ্ঞতা এই লেখার শুরুতেই বলেছি। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর যেদিন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট দিয়ে বেরিয়ে আসছি, সেদিন আমার উলটো অভিজ্ঞতা হল। সেদিন আমার হাতে ছিল মারাদোনার একটা পোস্টার। এয়ারপোর্টে অভিবাসন দফতরের এক পদস্থ কর্মী সুটকেস খুলে দেখার সময় জিজ্ঞেস করলেন "আপনার হাতে কী দেখি ?"

দেখালাম। মারাদোনার ছবি দেখে রাগে ছিঁড়ে ফেললেন সেই ভদ্রলোক। আমি তো সেই রাগ দেখে অবাক !

॥ ৯ ॥

মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে একটা লোক সম্পর্কে একটা পুরো দেশের ধারণা কীভাবে বদলে যেতে পারে, মারাদোনা তার বড় উদাহরণ। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ে তিনি ইতালীয়দের সঙ্গে চেয়েছিলেন। কিন্তু উলটোটা হয়ে গেল কয়েকটা ঘটনায়। মিলান শহরের সান সিরো স্টেডিয়ামে যেদিন আর্জেন্টিনা প্রথম ম্যাচটা খেলতে নামল, সেইদিনই বুঝেছিলাম উত্তর ইতালির লোকেরা কীরকম খাপ্পা মারাদোনার ওপর। ম্যাচটা ছিল ক্যামেরুনের সঙ্গে। যতবার মারাদোনা বল ধরলেন, গ্যালারিতে শিস, বেড়ালের ডাক। শেষে এমন হল, আর্জেন্টিনা ম্যাচটাই হেরে গেল। মারাদোনা টের পেয়ে গেলেন, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে বিশ্বকাপ জেতা তো দূরের কথা, টুর্নামেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ার পর ইতালিয়ান লিগ যখন শুরু হবে, তখন নাপোলির হয়ে খেলাও মুশকিল হয়ে যাবে। আগে ইতালিয়ানদের খুশি করা দরকার।

ইতালিয়ান টিম সম্পর্কে মারাদোনা তাই ভাল ভাল কথা বলতে লাগলেন। "জিয়ানলুকা ভিয়ালি বিশ্বের সেরা স্ট্রাইকার।" "রোবার্তো বাজ্জোর মতো প্লেয়ার ইউরোপে কমই আছে।" বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা যখন শুরু হল, তখন ইতালির ক্রীড়া-দৈনিক গেজেত্তা দে লা স্পোর্টস-এ একদিন একটা খবর

boierpathshala.blogspot.com

দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। আগের দিন গভীর রাতে মারাদোনা ইতালির হোটেলে গিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে এসেছেন ভিচিনিকে। এরকম হয় নাকি? ওইদিনই প্রেস সেন্টারের আড্ডায় শুনতে পেলাম পুরো ঘটনাটা। ইতালি দলটা ছিল মারিনো বলে একটা জায়গায়। পাহাড়ের ওপর ছোট্ট হোটেলে। বহু বছর আগে গরমের দিনে জুলিয়াস সিজার নাকি বিশ্রাম নিতে যেতেন ওই পাহাড়ি আবাসে। পারিষদদের সঙ্গে বসে পরিকল্পনা করতেন পরবর্তী যুদ্ধের। কোচ ভিচিনির পছন্দ মারিনো জায়গাটা।

তেগোরিয়া থেকে মারিনোতে গিয়ে গভীর রাতে মারাদোনা সেদিন ঘুম থেকে ডেকে তুললেন, নাপোলিতে তাঁর সঙ্গে খেলেন, এমন তিন প্লেয়ারকে।

অন্য কেউ হলে প্রহরীরা বাধা দিতেন। কিন্তু দর্শনপ্রার্থী মারাদোনা। তাঁকে প্রহরীরা আটকাবেন কী করে? সঙ্গে তাঁর ১০ নম্বর জার্সি নিয়ে যান সেদিন মারাদোনা। গোটা তিনেক। কী ব্যাপার? না, তাঁর জার্সি উপহার দিতে চান নাপোলির প্লেয়ারদের। মারাদোনার জার্সি পাওয়া ভাগ্যের কথা। হইচই পড়ে গেল ইতালিয়ান ক্যাম্পে। ঘুম থেকে ভিচিনিও উঠে এলেন। মারাদোনা সেদিন বললেন, "সবচেয়ে ভাল হয়, যদি আর্জেন্টিনা আর ইতালি ফাইনালে খেলে।" তাঁর এই কথাগুলোর অন্যরকম ব্যাখ্যা হয়েছিল পরে। অনেকে বলেছিলেন, জার্সি উপহার দিতে গিয়ে মারাদোনা বুঝিয়ে দিয়ে আসেন, অঙ্ক কষে খেলো ভাইয়েরা। দেখো, ফাইনালের আগে যেন আমরা মুখোমুখি না হই।

ইতালির বিশ্বকাপের সময় একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যায়, কোচ বিলার্ডোর হাতে আর আর্জেন্টিনা টিমটা নেই। মারাদোনা *যা বলবেন,* তাঁকে তাই করতে হবে। তেগোরিয়ার টিমের সঙ্গে যথারীতি মারাদোনার সঙ্গে ছিলেন মা-বাবা, ভাইবোনেরা। একটা জাতীয় দলের সঙ্গে আত্মীয়-পরিজনদের নিয়ে কেউ থাকতে পারেন, ভাবা যায় না। কিন্তু মারাদোনার পক্ষে সবই সম্ভব। একদিন তেগোরিয়ায় প্রচণ্ড ঝামেলা হল। সামান্য ব্যাপার। মারাদোনার এক ভাই রাউল গভীর রাতে ক্যাম্পে ঢুকতে গেলে,

boierpathshala.blogspot.com

ইতালিয়ান পুলিশ বাধা দেয়। ভাষা সমস্যার জন্য 'ক্যারিবিনিয়ারি' (পুলিশ) বুঝতে পারেনি, লোকটা কে। রাউল হাত চালিয়ে, বেড়া টপকে বাংলোর ভেতর ঢুকে পড়েন। পুলিশ তাঁকে তাড়া করে। খবরটা পৌঁছয় মারাদোনার কাছে। কোনও কথা না শুনে তিনি পুলিশকে পেটাতে শুরু করেন। ভাঙচুর করতে থাকেন। পরদিন কাগজে দেখলাম, ভাঙচুরের ছবিতে ছয়লাপ। মারাদোনা বললেন, "এটা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ইতালিয়ানদের ষড়যন্ত্র। তাঁরা চান না, আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ান হোক।" বুয়েনস আইরেস থেকে পরদিন খবর, ওখানকার ইতালিয়ান দূতাবাস ভাঙচুর হয়েছে। ইতালির পুলিশ মারাদোনা আর রাউলের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করেছিল। সরকারের চাপে তা তুলে নিল। কিন্তু এই ঘটনাটা ইতালির মানুষ ভালভাবে নিলেন না। মারাদোনার গুণ্ডামি তাঁরা আর বরদাস্ত করতে রাজি নন।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনাকে কিন্তু আটকানো যাচ্ছিল না। ইতালিয়ানরা সহ্য করুন বা না করুন। ব্রাজিলের সঙ্গে ম্যাচ পড়ল তুরিনের স্টেডিয়ামে। দর্শকরা শিস দিতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু মারাদোনা তাঁদের চুপ করিয়ে দিলেন অবিশ্বাস্য খেলে। ক্যানিজিয়াকে দিয়ে গোল করালেন। ওই ম্যাচের এক ঘণ্টা পর পশ্চিম জার্মানি-হল্যান্ড ম্যাচ মিলানে। সেই ম্যাচ, যাতে রাইকার্ড আর রুডি ফোলার লাল কার্ড দেখেন। ব্রাজিলকে ১-০ গোলে হারিয়ে মারাদোনা সেদিন এমন তৃপ্ত, প্রেস কনফারেন্সে এলেন মাথায় বেগুনি মুকুট পরে। সেদিন হল্যান্ড হেরে যাওয়ায় মারাদোনা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান, আসল ম্যাচ সেমিফাইনালে ইতালির সঙ্গে। খেলাটা হবে নাপোলির সান পাবলোতে। তাঁর নিজের ক্লাবের সমর্থকদের সামনে। ম্যাচের কয়েকদিন আগে তিনি একটা চাল চাললেন। নাপোলির লোকেদের প্রতি ইতালির সরকারের উপেক্ষার কথা তিনি মনে করিয়ে দিলেন।

সেদিন সান পাবলো স্টেডিয়ামে আমিও ছিলাম। ইতালীয় সাংবাদিকদের 'টেনশন' নিজের চোখে দেখেছিলাম। তাঁরা কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলেন না মারাদোনাকে। সেমিফাইনাল ম্যাচটা যেন ফুটবলের শেষ ম্যাচ। হারলে আর

boierpathshala.blogspot.com

কোনওদিন কেউ ফুটবলের নাম উচ্চারণ করবে না। নাপোলির রেল স্টেশনের খুব কাছেই সান পাবলো স্টেডিয়াম। স্টেশন থেকে হেঁটে যাওয়ার সময়ই সেদিন লক্ষ করেছিলাম, শহরটা পুরোপুরি মারাদোনার। রাস্তায় মারাদোনার পোস্টার ও ব্যাজ বিক্রি হচ্ছে। ভিয়ালি, বাজ্জো আর স্কিলাচিদের নিয়ে যেন কারও মাথাব্যথা নেই। রাস্তায় নাচতে-নাচতে যাচ্ছেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। পুরো স্টেডিয়াম চত্বরটাই তাঁরা দখল করে নিয়েছেন। সেদিনই বুঝেছিলাম, নাপোলির ওপর মারাদোনার নিয়ন্ত্রণ কতটা।

উত্তর আর দক্ষিণ ইতালির মানুষ যেন সেদিন আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। মারাদোনার একটামাত্র কথায়, "উত্তরের লোকেরা এখন নাপোলির মানুষদের বলছে ইতালিকে সমর্থন করতে। একটা দিনের জন্য ইতালিয়ান হতে। অথচ বছরের বাকি ৩৬৪ দিন নাপোলির কথা তাদের মনে থাকে না। নাপোলির মানুষ কিন্তু এই বৈষম্যের কথা ভুলবে না।" মারাদোনার এই কথায় নাপোলির মানুষ কিন্তু সাড়া দিয়েছিলেন। ম্যাচের দিন ইতালিকে তাঁরা মন থেকে সমর্থন করেননি। ম্যাচ গড়িয়েছিল টাইব্রেকার পর্যন্ত। জয়সূচক গোলটা করেন মারাদোনা। সেদিন নাপোলি থেকে গভীর রাতে রোমে ফেরার পর মনে হয়েছিল যেন কোনও প্রেতপুরীতে হাঁটছি। ইতালি জিতলে যেসব রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হত, হর্নের শব্দে কানে তালা লেগে যেত, সেই রাস্তাগুলো এখন নির্জন। প্রচণ্ড আঘাতে ইতালিয়ানরা চুপ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা পেরোতে-না-পেরোতেই তাঁদের রাগ গিয়ে পড়েছিল মারাদোনার ওপর। এই লোকটার জন্যই তাঁরা বিশ্বকাপ জিততে পারলেন না। পালটা আঘাত করার জন্য তাঁরা কিন্তু তৈরি হয়ে রইলেন।

আর্জেন্টিনাকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান করানোর জন্য যা কিছু করা দরকার, সেবার মারাদোনা করেছিলেন। বিশ্বকাপ হল যুদ্ধ। তাঁর দিক থেকে মারাদোনা অবশ্যই ঠিক। নিজের খেলোয়াড়-জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়েও তিনি দেশকে জেতাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না। ইতালির বিশ্বকাপে দু'জনের কান্নার কথা আমার

boierpathshala.blogspot.com

মনে থাকবে। এক, গাসকয়েনের। দুই, মারাদোনার। সেমিফাইনালে মার্চিং অর্ডার পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় গাসকয়েন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। ববি রবসন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে থাকলেন। তখনও টাইব্রেকার হয়নি। গাসকয়েন কেঁদেছিলেন এই ভেবে যে, টিম যদি ফাইনালে ওঠে তা হলে তিনি খেলতে পারবেন না। তাঁর কান্না থেমে যায়, টাইব্রেকারে পশ্চিম জার্মানি জিতে যাওয়ার পর। কিন্তু মারাদোনা ? ফাইনালে হেরে যাওয়ার পর তিনি কাঁদলেন কেন ? তাঁর মতো কিংবদন্তি এক ফুটবলারের পক্ষে কি এটা শোভা পায় ? পুরস্কার নেওয়ার সময়ও তিনি অখেলোয়াড়সুলভ আচরণ করলেন। ফিফা প্রেসিডেন্ট হ্যাভেলাঞ্জ হ্যান্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে, মারাদোনা হাত সরিয়ে নেন। সেদিন রোমের প্রেস সেন্টারে খেলার পর মারাদোনা আমাদের সামনেও এলেন না। বিলার্ডো এসে দরজার বাইরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেননা মঞ্চে তখন বসে ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার। হঠাৎ সবার চোখ গেল বিলার্ডোর দিকে। বেকেনবাওয়ার মঞ্চ থেকে নেমে, বিলার্ডোর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে, তাঁকে তুলে আনলেন মঞ্চে। ওই দৃশ্য দেখে মনে হয়েছিল, মারাদোনারা জীবনেও বেকেনবাওয়ার হতে পারবেন না, ফুটবলার হিসেবে তাঁরা যত প্রতিভাবানই হোন।

রোমের ওলিম্পিক স্টেডিয়ামের সেই কান্না মারাদোনা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন বুয়েনস আইরেসের প্রেসিডেন্ট প্যালেসেও। দেশের ফেরার পর প্রেসিডেন্ট কার্লোস মেনেম তাঁকে যখন ডেকে পাঠান, তখন মারাদোনা কাঁদতে-কাঁদতে বলেন, "রেফারিরাই আমাদের হারিয়ে দিল।" মেনেম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তাতে কী হয়েছে। তোমাদের খেলা দেখে আমি খুশি। চেষ্টা করো, যাতে ১৯৯৪ সালে জিততে পারো।" মারাদোনা বললেন, "আমি কি আর তখন টিমে থাকব ?" মেনেম বললেন, "রজার মিল্লা যদি পারে, তা হলে তুমিই বা পারবে না কেন ?"এই কথাবার্তাগুলো হওয়ার সময়ও কোচ বিলার্ডো চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেদিন। কী আর বলবেন ? আর কেউ জানুক বা না জানুক, তিনি জানতেন কেন তাঁর টিম খেতাব রক্ষা করতে

boierpathshala.blogspot.com

পারেনি। রোমে পৌঁছনোর পরই তিনি টিম সম্পর্কে একটা মন্তব্য করেন, "আমার টিমে একা মারাদোনা। আর তার সঙ্গে বাকি দশজন আছে।" কথাটা তিনি মন থেকে বলেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারেন, মারাদোনাকে বাজি রেখে তিনি ঠিক কাজ করেননি। ইতালি থেকে বিশ্বকাপ আনতে না পারার পেছনে একা ওই মারাদোনাই।

আর্জেন্টিনার সাংবাদিকরা পরে অবশ্য আরও অনেক কারণ খুঁজে বের করেন। তাঁরা তা লিখেওছেন। সের্জেই লেভেনস্কিই মারাদোনাকে নিয়ে একটা বই লিখেছে, 'রেবেলদে কোন কাউসা'। তাতে লিখেছে, "ইতালি বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে ডিয়েগোর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের তলায় প্রচণ্ড ব্যথা হয়। খেলা তো দূরের কথা, ও ভাল করে হাঁটতেও পারছিল না। তখন একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। ডাক্তার মাডেরো বললেন, ডিয়েগোর খেলা উচিত হবে না। তিনি ওকে ভর্তি করে দিলেন দেল মনডো নামে একটা নার্সিং হোমে। আমরা শুনলাম, ডিয়েগোর হেমাটোমা হয়েছে। ও কয়েকদিন নার্সিং হোমে রইল। সারা দেশের চোখ গিয়ে পড়ল ওই দেল মনডোতে। ডিয়েগো যদি সুস্থ হয়ে উঠতে না পারে, তা হলে আর্জেন্টিনার কী হবে? যাই হোক, নার্সিং হোম থেকেই ও দেশবাসীর উদ্দেশে বলল, 'কোনও চোটই আমাকে দমিয়ে রাখতে পারবে না। ক্যামেরুন ম্যাচ থেকে আমি খেলবই। গায়ে জ্বর থাকলেও খেলব, না থাকলেও খেলব। পায়ে ব্যথা থাকলেও খেলব, না থাকলেও খেলব।' ওর কথা শুনে তখন সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল।"

ইতালিতে যাওয়ার আগে আর্জেন্টিনা দল কয়েকদিন ছিল ফ্রান্সের সীমান্তে স্পেনের একটা জায়গায়। সেখানেই মারাদোনা জানতে পারেন ক্যানিজিয়াকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবছেন বিলার্ডো। তাঁর জায়গায় ঢোকাচ্ছেন বালবো-কে। বিলার্ডোর এই সিদ্ধান্তটা মারাদোনা মানতে পারলেন না। দু'বছর আগে কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্টের সময়ে ক্যানিজিয়ার সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়ে যায়। টিম থেকে তাঁর বাদ পড়া একদম পছন্দ করলেন না

boierpathshala.blogspot.com

মারাদোনা। এর আরও একটা কারণ ছিল। উঠতি প্লেয়ার বালবো-কে তিনি দু'চোখে দেখতে পারতেন না। একে বালবো পাসারেল্লার ক্যাম্পের লোক। তার ওপর নিজের খেলা খেলতে চান। কিন্তু আর্জেন্টিনা টিমে খেলতে হলে, তাঁকে তেমনভাবে খেলতে হবে, যেমনটি চান মারাদোনা। কোনও প্রশ্ন তোলা চলবে না। যিনি প্রশ্ন তুলবেন, তিনি শেষ। মারাদোনা গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন বিলার্ডোকে, "ক্যানিজিয়াকে বাদ দিচ্ছেন কেন ?" বিলার্ডো তাঁকে বোঝালেন, "ক্যানিজিয়ার ডিফেন্স বলতে কিছু নেই। বালবো-র আছে। এবারের টিমে বালবো-র মতো প্লেয়ারের বেশি দরকার।" মারাদোনা তখন আবিষ্কার করলেন, টিম কী ট্যাকটিকসে খেলবে সে-সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবুও, তিনি জেদ ধরে রইলেন, প্রথম এগারোজনের মধ্যে না হোক, বাইশজনের মধ্যে ক্যানিজিয়াকে রাখতেই হবে। বাধ্য হয়ে বিলার্ডো তাঁর কথা মেনে নিলেন। মনঃক্ষুণ্ণ হলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলপ্রেমীরা। সেই প্রথম তাঁরা বলতে শুরু করলেন, নাপোলির লোকেরাই ডিয়েগোকে শেষ করে দিয়েছে। ডিয়েগো অনেক বদলে গেছেন।

সাফল্য মানুষের অনেক দোষত্রুটি ঢেকে দেয়। ব্যর্থতার সময় সেগুলিই অনেক বড় হয়ে ওঠে। বিশ্বকাপ হয়ে যাওয়ার পর আর্জেন্টিনার তো বটেই, ইতালিতেও মারাদোনা লোকের চোখে খুব খারাপ হয়ে গেলেন। প্রতি পদে পদে অসহযোগিতা করতে লাগলেন ইতালির মানুষ। সেমিফাইনালে হারের কথা তাঁরা ভুলবেন কী করে ? মারাদোনা যখন ফের নাপোলি ক্লাবে খেলতে এলেন, তখন সমর্থকরা একদিন ইট মেরে তাঁর গাড়ির কাচ ভেঙে দিলেন। কয়েকদিন পর তাঁর দিদি মারিয়ার ফ্ল্যাটে রহস্যময় চুরি হল। চোরেরা ঘরে ঢুকে মূল্যবান কোনও জিনিসে হাতই দিল না। কিছু কাগজপত্র নিয়ে গেল। পর পর দুটি ঘটনায় মারাদোনা যুদ্ধঘোষণা করলেন নাপোলিটানদের বিরুদ্ধে। তিনি বুঝতে পারলেন, এটা কামোরাদের কাজ। এর পরই ফের ডাকাতি। নাপোলির ব্যাঙ্কো প্রভিনশিয়াল ডি নাপোলিতে মারাদোনার ভল্ট থেকে। ডাকাতরা ৮৬টা বাক্স নিয়ে চলে যায়। তার মধ্যে রাখা

boierpathshala.blogspot.com

ছিল ১০ লক্ষ ডলার, তার থেকে মূল্যবান আরেকটা জিনিস—১৯৮৬তে পাওয়া সেরা ফুটবলারের সোনার বল। কাগজে ফলাও করে এই খবরটা বেরোল। তবুও আটজন ডাকাতের কেউ ধরা পড়ল না।

খবরের কাগজ এর পর আরও একটা বড় ক্ষতি করে দিল মারাদোনার। ইল মাত্তিনো নামে একটা কাগজ মাঝে একটা ছবি ছাপল। কামোরা মানে মাফিয়াদের এক গোষ্ঠীর নেতা গুইলিয়ানের দুই ছেলের মাঝে দাঁড়িয়ে, এক পার্টিতে শ্যাম্পেনের বোতল খুলছেন মারাদোনা। চার বছর আগে তোলা সেই ছবি। নীচে ক্যাপশন, 'কামোরাদের প্রিয় ফুটবলার ডিয়েগো মারাদোনাকে আক্রমণ করার স্পর্ধা দেখাচ্ছে কে?' আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সাংবাদিকরা মারাদোনাকে সাহায্য করতেই চাইছেন। কিন্তু আসলে তাঁরা বোঝাতে চাইলেন, মারাদোনার সঙ্গে সুসম্পর্ক আছে মাফিয়াদের। খবরের কাগজের লোকেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে মারাদোনা সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি। একটা ঘটনায় তামাম ইতালিয়ান সাংবাদিকরা চটে গিয়েছিলেন মারাদোনার ওপর। আগে সেই ঘটনাটার কথা বলি।

নাপোলিতে যাওয়ার পর প্রথম চার-পাঁচ বছর মারাদোনা খুব নাচিয়েছিলেন সাংবাদিকদের। ইতালির মানুষরা ফুটবল-পাগল। ফুটবলারদের সম্পর্কে নানা কথা জানতে প্রচণ্ড আগ্রহী। ওখানে খেলার পত্রিকার বিক্রি খুব বেশি। রোমে থাকার সময় দেখেছি, খেলার দু'টি কাগজ 'গেজেত্তা দে লা স্পোর্টস' আর 'কোরিয়েরা দে লা স্পোর্টস' খুব জনপ্রিয়। দুটিরই প্রচারসংখ্যা অবাক করার মতো। পাঁচমিশেলি কাগজ 'এল রিপুবলিকা' যেখানে বিক্রি হয় দিনে তিন লক্ষ, সেখানে খেলার এক-একটি কাগজের প্রচারসংখ্যা দিনে ১০ লক্ষেরও বেশি। কোরিয়েরা দে লা স্পোর্টসের এক রিপোর্টার জুইসেপ্পে পাসিলিওর সঙ্গে মারাদোনার একবার মনোমালিন্য হয়েছিল। লিগের একটা ম্যাচে এ এস রোমা-র কাছে নাপোলি ৩-০ গোলে হারে। সেই ম্যাচে মারাদোনা খুব বিশ্রী খেলেন। পরদিন পাসিলিও লেখেন, "মারাদোনা আর চার বছর আগেকার মারাদোনা নেই। ও শেষ হয়ে গেছে।"

boierpathshala.blogspot.com

৬২ বছর বয়সী পাসিলিওর এই রিপোর্ট স্বভাবতই মারাদোনা পছন্দ করেননি। তিনি তখন চ্যানেল ৩৪-এ একটা অনুষ্ঠান করতেন। তাতে পাসিলিওকে আমন্ত্রণ জানালেন। পাসিলিও বোঝাবেন, কেন তিনি লিখেছেন মারাদোনা শেষ হয়ে গেছেন। আর মারাদোনা উত্তর দেবেন, কেন তিনি ফুরিয়ে যাননি। এ-ধরনের মুখোমুখি অনুষ্ঠান ও-দেশে লোকে খুব পছন্দ করে। তা, টিভি স্টেশনে পাসিলিও আর মারাদোনা একদিন মুখোমুখি হলেন। দু'জনের মধ্যে তুমুল তর্ক শুরু হল। শেষে মারাদোনা চরম অপমান করলেন পাসিলিওকে। কোরিয়েরা দে লা স্পোর্টস-এর ওই রিপোর্টটা তিনি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান চলার সময়ই, ক্যামেরার সামনে জোর করে তিনি খবরের কাগজের সেই কাটিং পাসিলিওর মুখের ভেতর গুঁজে দিলেন। অর্থাৎ আপনি যা লিখেছেন, তা গিলতে হবে। এই দৃশ্য দেখে ইতালির সব সাংবাদিকই বদলা নেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে গেলেন।

প্রথম আঘাতটা করল 'গেজেত্তা দে লা স্পোর্টস'। লিগের একটা ম্যাচে মারাদোনা ফের খারাপ খেলায় তারা লিখল, "মারাদোনা কি অসুস্থ? খেলার সময় তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, তিনি সুস্থ নন। কী হল মারাদোনার?" গেজেত্তার রিপোর্টার সামান্য ইঙ্গিত দিলেন সেদিন, মারাদোনার মাদকাসক্তি নিয়ে। এটা পড়ে রাগ করে মারাদোনা চলে গেলেন বুয়েনস আইরেসে। কিন্তু নাপোলি-কর্তারা মামলা করার হুমকি দেওয়ায় তিনি ফের ফিরে এলেন নাপোলিতে। ইচ্ছেমতো প্র্যাকটিসে যান। ম্যাচ খেলেন। ক্লাব-কর্তাদের তিনি স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন, নাপোলিতে আর থাকতে চান না। এইসব মন কষাকষির মধ্যেই এল উয়েফা কাপের ম্যাচ, মস্কোর স্পার্টাক ক্লাবের বিরুদ্ধে। খেলা মস্কোতে। যেদিন টিম মস্কো যাওয়ার জন্য এয়ারপোর্টে হাজির হল, সেদিন মারাদোনা বাড়িতে বসে রইলেন।

নাপোলির কোচ তখন বিগোন। তিনি মারাদোনাকে ধরে নিয়ে আসার জন্য এয়ারপোর্ট থেকে তিনজনকে পাঠালেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মারাদোনা দেখাই করলেন না। টিম মারাদোনাকে

boierpathshala.blogspot.com

ফেলে রেখে চলে গেল। এই ঘটনায় নাপোলির কর্তারা বসে ঠিক করলেন, তাঁরা আর সহ্য করবেন না। মারাদোনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। তাঁরা বেতনের ৪০ ভাগ কেটে নিলেন। খবরটা পেতেই মারাদোনা ঠিক করলেন, একা প্লেন ভাড়া করে তিনি মস্কোয় যাবেন। খরচ পড়বে ৩০ হাজার ডলার। তাতে কিছু আসে-যায় না। তিনি প্লেয়ার হিসেবে যাবেন না। শুধু দেখতে যাবেন, মারাদোনাকে বাদ দিয়ে নাপোলি টিম কেমন খেলে। উয়েফা কাপের সেই খেলায় নাপোলি টাইব্রেকারে হেরে গেল। মারাদোনা প্রমাণ করে দিলেন, তাঁকে ছাড়া নাপোলি ম্যাচ জিততে পারে না।

বল তখন মারাদোনার কোর্টে। তাঁর পরিষ্কার বক্তব্য, "নাপোলিতে খেলা আর সম্ভব না। আমাকে অন্য কোনও ক্লাবে যেতে দেওয়া হোক। নিজের ইচ্ছেয় তিনি চুক্তিভঙ্গ করতে পারেন না। কেননা, ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত। ক্লাব-কর্তাদের বিপদে ফেলার জন্য মাঝেমধ্যেই তিনি বিমানে প্রথম শ্রেণীতে বুয়েনস আইরেসে চলে যেতেন। এতে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হতে লাগল নাপোলির। কিন্তু অন্যদিকে, জেদ চেপে গেছে ক্লাব প্রেসিডেন্ট ফার্লাইনোর। মারাদোনাকে তিনি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। একবার মারাদোনা যখন ইতালিতে নেই, সেই সময় ফ্রান্সের ওলিম্পিক মার্সেই আগ্রহ দেখাল তারা মারাদোনাকে চায়। মোটামুটি তারা বেশ ভাল দর দিল। খবরটা পেয়ে মারাদোনা ইতালিতে এলেন। কিন্তু বিমানে বসেই শুনলেন, ফার্লাইনো মার্সেই ক্লাবের প্রস্তাবে রাজি হননি। মারাদোনা আর বিমান থেকে নামলেন না। সোজা ফিরে গেলেন বুয়েনস আইরেসে। পরের মাসে নাপোলি অর্ধেক বেতন কেটে নিল।

এদিকে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা কিন্তু মারাদোনার পিছু ছাড়েননি। তাঁরা মারাদোনাকে জব্দ করার জন্য তক্কে তক্কে রইলেন। নাপোলিতে লা রুসো নামে মাফিয়া গোষ্ঠীর এক নেতা ছিলেন তখন। তাঁর হয়ে কাজ করতেন কার্মেলা সিঙ্গুয়েরামা বলে একজন মহিলা। তাঁর কাছ থেকে মারাদোনা মাঝেমধ্যে টেলিফোনে 'গিয়ার' চাইতেন। পুলিশের কাছে এই খবরটা

boierpathshala.blogspot.com

পৌঁছেছিল। তারা মারাদোনা, লা রুসো আর সিঙ্গুয়েরামার বাড়ির টেলিফোন ট্যাপ করতে লাগল। ১০ হাজার ফোন কল রেকর্ড করে পুলিশ শুনতে পেল, মারাদোনা ১১ বার 'গিয়ার' চেয়েছেন। গিয়ার কথাটার আসল মানে 'কোকেন'। পুলিশ মামলা করল মারাদোনার বিরুদ্ধে। কিন্তু আদালতে কিছুই প্রমাণ করতে পারল না। মারাদোনা ছাড়া পেয়ে গেলেন। আর বারবার বলতে লাগলেন, তিনি নির্দোষ। মাফিয়ারা ইচ্ছে করে তাঁকে বিপদে ফেলছেন। অনেকে বিশ্বাসও করলেন তাঁর কথা।

এরই মধ্যে ইতালির প্যালেস অব জাস্টিস-এ একদিন পিয়েত্রো পাগলিয়েসে নামে একটা লোক বিচারপতির কাছে বয়ান দিতে এলেন, মারাদোনা শুধু নিজেই কোকেন সেবন করেন, তাই নয়। আর্জেন্টিনা থেকে নিজে মাদক পাচারও করেন। পাগলিয়েসে এক সময় নাপোলি ক্লাবে গার্ড হিসেবে চাকরি করতেন। তাঁর সঙ্গে মাফিয়া জগতের সম্পর্ক ছিল। মারাদোনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর পাগলিয়েসে চাকরি ছেড়ে দেন। মারাদোনার ড্রাইভারের কাজ নেন। পাগলিয়েসে বিচারপতিকে বললেন, "মারাদোনা তাঁকে দিয়ে বেশ কয়েকবার মাদক পাচার করিয়েছেন। এর জন্য দিয়েছেন ১০ হাজার ডলার। পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানল, সত্যিই ব্যাঙ্কে পাগলিয়েসের নামে প্রচুর অর্থ জমা আছে। আদালতে ফের ডাকা হল মারাদোনাকে। তিনি আকাশ থেকে পড়লেন অভিযোগ শুনে। তারপর বললেন, "পাগলিয়েসে আমার কাছ থেকে কিছু অর্থ নিয়েছিল বটে, তবে তা অন্য কারণে। ও বলেছিল, একটা ফুটবল অ্যাকাডেমি করতে চায়। তার জন্য জমি কিনবে। তারপর ধীরে-ধীরে টাকা-পয়সা শোধ করে দেবে। মাদক পাচারের কিছুই আমি জানি না। ওই টাকা ও মাদক পাচারে খরচ করবে জানলে আমি দিতাম না।"

এইভাবে ফের আদালত থেকে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে এলেন মারাদোনা। কিন্তু নাপোলি কর্তারা তাঁকে ছাড়বেন কেন? ইতালি ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট তখন মাতারাসে। তিনি নাপোলি কর্তাদের ডেকে গোপনে বললেন, মারাদোনার 'ডোপ' পরীক্ষা করতে হবে। ডোপ পরীক্ষা হলে মারাদোনা ধরা পড়বেনই,

boierpathshala.blogspot.com

কোকেন নিয়েছেন। সেই প্রমাণ আদালতে তুলে দেওয়া যাবে। তখন তাঁর জেল খাটা কেউ আটকাতে পারবেন না। কিন্তু *মাতারাসে বা ফার্লাইনো—কেউ জানতেন না,* ওদিকে মারাদোনাও পালটা প্যাঁচ কষছেন। ম্যানেজার কপোলাকে ডেকে তিনি বলে দিয়েছেন, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে, যাতে ফার্লাইনো বাধ্য হন ছেড়ে দিতে। লিগের একটা ম্যাচে মারাদোনাকে যখন ডোপ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হল, সেই সময় তিনি মনে মনে হাসছেন। পরদিনই ছুতো করে তিনি উড়ে গেলেন বুয়েনস আইরেসে। এক সপ্তাহ পর খবর পেলেন, তাঁর প্রস্রাবের নমুনায় সামান্য কোকেন পাওয়া গেছে। ইতালির ফুটবল-সংস্থা তাঁকে সাসপেন্ড করেছে।

নাপোলি ক্লাবে যাওয়ার আর প্রশ্নই নেই। মারাদোনা রয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রী ক্লাউদিয়া, দুই মেয়ে ডালমা ও খিয়ানিনি আর মা-বাবার সঙ্গে। আন্দ্রিজ পর্বতের ধারে বারিলোচা নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে মাঝেমধ্যে মারাদোনা মাছ ধরতে যেতেন। সেখানে গিয়ে তিনি মনের সুখে মাছ ধরতে লাগলেন। এই নেশাটা তাঁকে ধরান চিতোরো। এদিকে, ইতালির একটা কাগজ তুতো স্পোর্টস লিখেই দিল, মারাদোনা আর ফিরবেন না। বারিলোচাতে তিনি মনের সুখে মাদক সেবন করছেন। আর্জেন্টিনার লোকেরাও খুব বিরক্ত হচ্ছিলেন ডিয়েগোর ওপর, নানারকম লেখালেখি হওয়ায়। মুশকিলে পড়েছিলেন প্রেসিডেন্ট মেনেমও। মারাদোনাকে তিনি আর্জেন্টিনার কূটনীতিকের পাশপোর্ট দিয়েছিলেন। ইতালির কোনও একটা কাগজ সেই সময় লিখেছিল, মারাদোনা কূটনীতিকের পাশপোর্ট বিশ্রীভাবে ব্যবহার করছেন। ওই পাশপোর্ট থাকায় তিনি মাদক চালান করতে পেরেছেন। তাঁকে পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি।

১৯৮৯ সালে নির্বাচনে জিতে মেনেম যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন তিনি একবার মারাদোনাকে লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেন। কিন্তু মারাদোনা তাঁর নেমন্তন্নে সাড়া দেননি। এর কিছুদিন পর কোনও একটা অনুষ্ঠানে মারাদোনার সঙ্গে দেখা হয় মেনেমের। ভদ্রতা করে মেনেম তাঁর পাশে বসতে বলেন মারাদোনাকে। আসলে

boierpathshala.blogspot.com

তিনি খাতির জমাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারাদোনা তখন বলেন, "আমার হাতে একদম সময় নেই। আমাকে এখুনি টিভি প্রোগ্রামে যেতে হবে।" মেনেমকে প্রথমদিকে তিনি গুরুত্ব দেননি। পরে কোনও কারণে তাঁর মনে হয়, মেনেম লোকটা খারাপ নন। তখন খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে বসেন, "মেনেম আর্জেন্টিনার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট।" লোকে শুনল, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব মারাদোনার। যখন-তখন গিয়ে দেখা করেন। কাজ বাগিয়ে আনেন। এর ফলে একদল লোক আবার মেনেমের ওপর অসন্তুষ্ট। রাষ্ট্রপতি কেন দুর্বিনীত এক ফুটবলারকে এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন ? এই সমালোচনা মেনেমের কানেও পৌঁছল। ইতালিতে আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রদূতও মারাদোনা সম্পর্কে খুব খারাপ রিপোর্ট দিলেন। এই লোকটার জন্যই দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরছে।

ঠিক এই পরিস্থিতিতে, মারাদোনাকে একদিন পুলিশ ধরে ফেলল মাদক সেবন করার সময়। এল সোলদাদিতো বলে একটা বাড়ির ফ্ল্যাটে কোকেন নিয়ে নেশায় তিনি তখন আচ্ছন্ন হয়ে ছিলেন। খবরটা মুহূর্তের মধ্যে রটে গেল সারা দেশে। জামিন নিয়ে যখন মারাদোনা ফিরে এলেন, তখন পরিবারের কাছে মুখ দেখাতে পারছেন না। অনেকে বলেন, পুলিশের এই তৎপরতার পেছনে রাষ্ট্রপতি মেনেমের হাত ছিল। তিনি একটু জব্দ করতে চাইছিলেন মারাদোনাকে। কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি খুব সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন। মারাদোনা যাতে চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে ওঠেন, সেজন্য দু'জন সাইকোলজিস্টকেও তিনি পাঠালেন মারাদোনার প্রাসাদে।

আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার প্রেসিডেন্ট খুলিও গ্রোন্দোনারও প্রচণ্ড রাগ ছিল মারাদোনার ওপর। এর কারণ, টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া। মেক্সিকো বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর গ্রোন্দোনা ঘোষণা করেন, প্রত্যেক প্লেয়ারকে ৩৮ হাজার ডলার করে পুরস্কার অর্থ দেবেন। কিন্তু মাঝখান থেকে বাগড়া দেন মারাদোনা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সব ফুটবলার একই পুরস্কার অর্থ পাবেন কেন ? বিশ্বকাপ জয়ে সবার অবদান কি সমান ? বোচিনি

boierpathshala.blogspot.com

একটা ম্যাচে মাত্র ১৩ মিনিট খেলেছেন। তিনি কেন মারাদোনার সমান অর্থ পাবেন ? পরে শোনা যায়, মারাদোনা নিজের জন্য চার লাখ ডলার ছিনিয়ে নিয়ে গেছেন। কোনও উপায় ছিল না তখন। মারাদোনা বিশ্বকাপের পর আর্জেন্টিনার রাজা। তিনি গ্রোন্দোনার বিরুদ্ধে একটা বিবৃতি দিলে আসন টলমল হয়ে যাবে। সেই রাগ দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যান তখনকার মতো গ্রোন্দোনা। পরে পুরো শোধ তুলেছিলেন। কীভাবে, সেটা বলা যাক।

॥ ১০ ॥

মারাদোনা কেন মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন, তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই। এই বদভ্যাসের পেছনে অনেকে কপোলাকে দায়ী করেন। চিতোরো, তোতা, ক্লাউদিয়া—সবারই এই ধারণা। বুয়েনস আইরেসের পুলিশ কোকেন সেবনের জন্য মারাদোনাকে ধরে, জামিন দেওয়ার পর থেকে কপোলার কপাল পোড়ে। ওই সময় রাষ্ট্রপতি মেনেম মারাদোনাকে সারিয়ে তোলার জন্য, দু'জন বিখ্যাত সাইকোলজিস্টকে পাঠান। তাঁরা তিন সপ্তাহ একেবারে নজরবন্দি করে রেখেছিলেন তখন মারাদোনাকে। সেই সময় কপোলা একদিন দেখা করতে গেলে, মারাদোনার পরিবারের লোকজন তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন।

পরে সের্জেই লেভেনস্কিকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, মারাদোনার জীবনটাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য কপোলা কতটা দায়ী ? সের্জেই বলেছিল, "অনেকটাই। তবে কোকেন ধরানোর জন্য ও দায়ী নয়। মারাদোনা এই অভ্যাসটা করে বার্সেলোনা ক্লাবে থাকার সময়। আসলে কী জানো, সিস্টার্সপিলারকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে মারাদোনা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। সিস্টার্সপিলারকে তবুও ও খানিকটা সমীহ করত। কারণ, সিস্টার্সপিলারের কাছে ও কিছুটা ঋণী ছিল। সিস্টার্সপিলারই প্রথম ওকে পয়সার মুখ দেখায়। কিন্তু মারাদোনার পরিবারের

boierpathshala.blogspot.com

সবাই এমন খরচ করতে শুরু করল যে, সিস্টার্সপিলার একটা সময় বুঝতে পারল, ফতুর হতে বেশি সময় লাগবে না। ও নানা ছল-ছুতোয় টাকা দেওয়া বন্ধ করল। তখন পরিবারের লোকজন মারাদোনার কানে বিষ ঢালতে লাগল। একটা সময় এল যখন মারাদোনা প্রোডাকসন্স যতটা লাভ করবে ভাবা হয়েছিল, ততটা করতে পারল না। মারাদোনা ভাবল, ম্যানেজারই টাকাটা মেরে দিয়েছে। ব্যস, সম্পর্ক শেষ দু'জনের মধ্যে। তারপর ম্যানেজার হয়ে, কপোলা কোনও কাজে বাধা দিত না মারাদোনাকে। এইভাবে ও খারাপ পথে ঠেলে দিল মারাদোনাকে।"

নাপোলিতে মারাদোনা আরও অনেক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েন। আনন্দ পেলে কোকেন নিতেন। দুঃখ হলে কোকেন নিতেন। ক্লাব-কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে কোকেন নিতেন। বিশ্বকাপ ফুটবলের পর নেশাটা তিনি আরও বাড়িয়ে ফেললেন। বোকা জুনিয়র্স ক্লাবের এক ডাক্তার আমাকে একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন আমেরিকায়। সেই সময় মারাদোনার খুব খারাপ সময় চলছে নাপোলিতে। বিশ্বকাপে হেরে যাওয়ার জন্য সারা ইতালির মানুষ রেগে আছেন মারাদোনার ওপর। পুলিশও। স্পেনের সেভিয়া ক্লাবের সঙ্গে মারাদোনা কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ওই সময় বোকা জুনিয়র্সের একটা দল প্রীতি-ম্যাচ খেলতে গিয়েছিল নাপোলিতে। সেই টিমের সঙ্গে ছিলেন লালো। ক্লাবের ডাক্তারের কথায়, "আমরা নাপোলিতে পৌঁছনোর পরই ডিয়েগো এল আমাদের হোটেলে দেখা করতে। ছোট ভাই লালোর সঙ্গে কথা বলবে। গাড়ি থেকে নেমে হোটেলে ঢুকতেই পুলিশ ওকে বলল, 'কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবে না।' ডিয়েগো তর্ক জুড়ে দিল। প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। আমরা সবাই হোটেলের লবিতে নেমে এলাম। পুলিশ ধাক্কা মারতে মারতে ডিয়েগোকে দরজার বাইরে নিয়ে গেল। কাচের দরজার এ-পাশে লালো, ও-পাশে ডিয়েগো। দু'জনেই কাঁদছে। অথচ কেউ কারও কথা শুনতে পারছে না। কাঁদতে কাঁদতেই ডিয়েগো শেষে ফিরে গেল। সেদিনই বুঝেছিলাম, ইতালি আর ওর পক্ষে নিরাপদ না। ইতালির পুলিশ ওকে ফাঁসিয়ে দেবে। পরের দিন লালোকে নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

আমিই গেলাম ডিয়েগোর ফ্ল্যাটে। গিয়ে দেখলাম, ড্রাগ নিয়ে ও বেহুঁশ হয়ে আছে। অন্যরা বলল, 'ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে না পেরে ডিয়েগো এত দুঃখ পেয়েছে যে, গত চব্বিশ ঘণ্টা কোকেন নিয়ে পড়ে আছে।'"

বুয়েনস আইরেসে কোকেন নেওয়ার অপরাধে যখন মারাদোনার বিরুদ্ধে প্রচুর লেখালেখি হচ্ছিল, সেই সময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান দুই ফুটবলার ভালদানো আর বাতিস্তা। ভালদানো একটু আধটু বামপন্থী রাজনীতি করতেন। মেনোত্তির ঘরানার। তিনি টিভি সাক্ষাৎকারে বলে বসলেন, "ডিয়েগোর কোনও দোষ নেই। এসব মেনেমের চক্রান্ত। দেশের লোক সরকারকে পছন্দ করছে না। সেইদিক থেকে লোকের মন সরিয়ে দেওয়ার জন্য মারাদোনাকে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।" বাতিস্তা অবশ্য সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললেন না। তিনি একটু নেপথ্যে থেকে মারাদোনার চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য করতে লাগলেন। টানা তিন মাস রোজ কিছু সময়ের জন্য মারাদোনার বাড়িতে গিয়ে তিনি বোঝাতে লাগলেন, মারাদোনা কত বড় ফুটবলার। সারা বিশ্বের লোক আরও কত কী আশা করেন তাঁর কাছ থেকে। ভিডিও ক্যাসেটে স্টেডিয়ামের গ্যালারির সেই সমবেত চিৎকার, "ওলে ওলে ওলে, ডিয়েগো ডিয়েগো" শুনে মারাদোনা ফের খেলার মাঠে ফেরার আকুতি অনুভব করলেন। মামলা যখন শুরু হল, তখন বিচারপতির কাছে তিনি বললেন, "আমি আর অন্য কিছু জানি না। আমি শুধু জানি, আমি একজন ফুটবলার। আমার দুই মেয়ের মাথায় হাত রেখে আমি দিব্যি দিতে পারি, ফুটবল ছাড়া আমার জীবনে আর কিছু নেই।" সারা আর্জেন্টিনা তাঁর কথা বিশ্বাস করে নিল। 'ক্লারিন' পত্রিকা সেই সময় একটা সমীক্ষা করেছিল, মারাদোনা দোষী, না নির্দোষ? ৭১ শতাংশ লোক তাতে বলেন, ডিয়েগো নিরপরাধ। সমসংখ্যক লোক মত দেন, পুলিশ যা-ই বলুক, ডিয়েগোকে এখনও তাঁরা আদর্শ বলে মনে করেন।

ভালদানো আর বাতিস্তার মতোই আরও একজন কিন্তু মারাদোনাকে লক্ষ করে যাচ্ছিলেন দূর থেকে। তিনি কার্লোস বিলার্ডো। তিনি তখন স্পেনের সেভিয়া ক্লাবের কোচ। তিনি

boierpathshala.blogspot.com

ভাবলেন, মারাদোনাকে যদি বাঁচাতে হয়, তা হলে ইতালি থেকে বের করে আনা দরকার। তাই সেভিয়া ক্লাবের কর্তাদের তিনি বললেন, "আপনারা মারাদোনাকে নিয়ে আসুন। তা হলে রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনাকে চ্যালেঞ্জ জানানো যাবে।" কিন্তু মারাদোনার এত বদনাম যে, ক্লাবের কিছু কর্তা কিছুতেই রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন, ক্লাবের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যাবে। শেষে বিলার্ডো কোনওমতে রাজি করালেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লুইস কুয়েরভাসকে। মারাদোনার সঙ্গে পাকা কথা হয়ে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা এসে দাঁড়াল, নাপোলি কিছুতেই ছাড়বে না মারাদোনাকে। ১৯৯৩ সাল অবধি তাদের সঙ্গে চুক্তি। ছ' মাস আগে তারা মারাদোনাকে সেভিয়ায় খেলতে দেবে কেন ? এ খবর যখন আর্জেন্টিনায় পৌঁছল, মারাদোনাও পালটা চাপ মারলেন। বললেন, ঠিক আছে নাপোলিতেই তিনি থেকে যাবেন। তবে নাপোলিকে একটা বাড়ি দিতে হবে। ছ' সপ্তাহ ছুটি দিতে হবে। আর তাঁর নামে ক্লাবের খাতায় যে টাকা ঋণ হিসেবে দেখানো আছে, তা খারিজ করে দিতে হবে। মারাদোনা জানতেন, তিনি দেশে চলে যাওয়ার পর থেকেই নাপোলির আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। তারা এইসব শর্ত পূরণ করতে পারবে না। শেষপর্যন্ত তাদের সেভিয়ার টোপ গিলতেই হবে।

মারাদোনার 'ট্রান্সফার' নিয়ে ইতালি আর স্পেনের মধ্যে সেই সময় তুমুল ঝগড়া চলল। জুরিখে বসে ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ রেখেছিলেন ফিফার দুই কর্তা—জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ আর জোসেফ ব্লাটার। মারাদোনার প্রতি দু'জনেরই সমর্থন ছিল না। কেননা, ১৯৯০-এর বিশ্বকাপের সময় ফিফা সম্পর্কে যা-তা বলে দিয়েছিলেন মারাদোনা। কিন্তু এঁরা ভাবলেন, মারাদোনা যতই খারাপ হোক, বিশ্বের সেরা ফুটবলার। এক-দেড় বছরের মধ্যে আমেরিকায় বিশ্বকাপ। ফুটবল ওই দেশে জনপ্রিয় নয়। মারাদোনাকে যদি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া যায়, তা হলে আমেরিকানরা ফুটবলে আকৃষ্ট হবেন। তাই ট্রান্সফার ঝামেলা থেকে ওকে বাঁচানো দরকার। ক্লাব ট্রান্সফারে সাধারণত ফিফা

boierpathshala.blogspot.com

মাথা ঘামায় না। কিন্তু হ্যাভেলাঞ্জ-ব্লাটার ফুটবল প্রসারের কথা ভেবে সেভিয়া আর নাপোলির কর্তাদের ডেকে পাঠালেন। ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা হল। শেষপর্যন্ত নাপোলি বিক্রি করে দিতে রাজি হল মারাদোনাকে। বুল ফাইটারের পোশাকে একদিন মারাদোনা হাজির হলেন সেভিয়া ক্লাবে।

বিলার্ডো নতুন উৎসাহে নামলেন মারাদোনাকে ফের ফুটবলপ্রেমী করার জন্য। এদিকে, আর্জেন্টিনার জাতীয় কোচ হয়েছেন তখন আলফিও বাসিলে। তিনি মেনোত্তি ঘরানার কোচ নন। বিলার্ডোকেও অনুসরণ করেন না। জাতীয় দলের প্রস্তুতির জন্য তিনি কয়েকটা ম্যাচের ব্যবস্থা করলেন। আর সেভিয়া থেকে ঘন ঘন ডেকে পাঠাতে লাগলেন মারাদোনাকে। বিলার্ডো তো বটেই, ক্লাব-কর্তারাও এটা পছন্দ করলেন না। লিগের ম্যাচে মারাদোনাকে পাওয়া যাচ্ছে না। টিমের সঙ্গে প্র্যাকটিস করছেন না। বিলার্ডো বারবার সতর্ক করতে লাগলেন তাঁর প্রিয় ফুটবলারকে। কিন্তু কে কার কথা শোনে? মাঝে একবার মারাদোনা জোরে গাড়ি চালানোর অপরাধে ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। খবরের কাগজে সমালোচনা হল। আর একবার এক নামী ডিস্কো ফ্লোরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় মারাদোনা ঝামেলা পাকিয়ে বসলেন 'সিকিউরিটি'-র লোকজনের সঙ্গে। তিনি বললেন, "কার সঙ্গে কথা বলছ তোমরা জানো? আমার এই পা ছোঁয়ার জন্য কত লোক জান দিয়ে দিতে রাজি?" এই কথাটা সেভিয়ার লোক ভালভাবে নিল না।

এই সময়ে বিলার্ডোর সঙ্গেও প্রচণ্ড মনোমালিন্য হয়ে গেল মারাদোনার। সেভিয়ার খেলা ছিল ছোট ক্লাব বুর্গোসের সঙ্গে। ফিটনেসের অভাব দেখে খেলার মাঝে হঠাৎই মারাদোনাকে তুলে নিলেন বিলার্ডো। মারাদোনা ভাবতেই পারেননি, তাঁকে বসিয়ে দেওয়ার স্পর্ধা কোনও কোচ দেখাতে পারেন। রিজার্ভ বেঞ্চে না বসে তিনি সরাসরি চলে গেলেন ড্রেসিংরুমে। সেখানে বিলার্ডোর নামে যা-তা বলে দিলেন সাংবাদিকদের কাছে, "ওকে আমি দেখে নেব, ও যদি পুরুষের বাচ্চা হয়...।" বিলার্ডোও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলেন না। দু'জনের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে গেল। বাড়ি

boierpathshala.blogspot.com

ফিরে বিলার্ডোর মাথা ঠাণ্ডা হল। তিনি ছুটে গেলেন মারাদোনার ফ্ল্যাটে। কিন্তু মারাদোনা তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন না। ওই ম্যাচটাই সেভিয়ার হয়ে মারাদোনার শেষ ম্যাচ। তিনি ফের বুয়েনস আইরেসে ফিরে এলেন। ফের কোকেনের নেশায় ডুবে গেলেন।

ক্লাব টিম থেকে বাদ পড়ার পর, মারাদোনা বাদ পড়লেন জাতীয় দল থেকেও। 'কোয়ালিফাইং ম্যাচ' বুয়েনস আইরেসে। অথচ টিমে নেই মারাদোনা। এটা অপমান হিসেবেই ধরে নিলেন তিনি। সাংবাদিকদের ডেকে বললেন, "বাসিলে যতদিন জাতীয় দলের কোচিং করবে, ততদিন আর্জেন্টিনার হয়ে খেলব না। ও যদি হাঁটু গেড়ে বসেও আমাকে অনুরোধ করে, তা হলেও না।" মারাদোনা এমন দুঃখ পেলেন, টিভি-তে ম্যাচ পর্যন্ত দেখলেন না। কোকেন নিয়ে পড়ে রইলেন। ক্লাউদিয়া সাইকোলজিস্ট ডেকে আনলে, তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন। হার সহ্য করার মানুষ নন তিনি। বাসিলের মতো লোকের কাছেও তিনি হেরে যাচ্ছেন, এটা সহ্য করবেন কী করে? সাধারণত রাতের দিকেই নেশা করতেন মারাদোনা। বাথরুমের ভেতর লুকিয়ে লুকিয়ে। ক্লাউদিয়া আর মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়লে তিনি চুপিচুপি ঢুকে যেতেন বাথরুমে। একদিন রাত চারটের সময় যখন কোকেন নিচ্ছেন, তখন বাথরুমের দরজায় টকটক শব্দ। দরজা খুলে মারাদোনা দেখেন বড় মেয়ে ডালমা। ঘুম থেকে উঠে এসেছে। মেয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি এরকম কেন বাবা? রাতে কেন ঘুমোও না?"

ডালমার কথা শুনে চোখ ফেটে জল এসে গেল। মারাদোনা বললেন, "আমার ঘুম পায় না মা। কেননা আমি মারাদোনা ...।" মারাদোনা কথা বলতেই লাগলেন। বিস্ফারিত চোখে তা শুনতে লাগল ডালমা। সেই রাতেই মেয়েকে ভিসা ফিওরিতোর সেই দিনগুলোর গল্প বলেছিলেন মারাদোনা। বলতে বলতেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন।

boierpathshala.blogspot.com

॥ ১১ ॥

দুই মেয়ে ডালমা আর খিয়ানিনিকে প্রচণ্ড ভালবাসেন মারাদোনা। সেভিয়া ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর কিছুদিনের জন্য রোজারিও-র নেওয়েল'স ওল্ড বয়েজ ক্লাবে যান তিনি। লোকে তখন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, এত ক্লাব থাকতে মারাদোনা কেন নেওয়েল'স ওল্ড বয়েজে? সেই সময় তিনি একটা কথা বলেছিলেন, "আমার মেয়েরা চাইল, তাই খেললাম।" অনেকেই এই কথাটা তখন বিশ্বাস করেননি। কিন্তু মারাদোনাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, এমন কিছু সাংবাদিকের মতে, কথাটার মধ্যে এক ফোঁটাও মিথ্যে নেই। মেয়েদের প্রতি তাঁর এমন অন্ধ স্নেহ, আরও একবার তাদের কথায় অবসর থেকে ফিরে এসেছেন।

বুয়েনস আইরেসে ক্লাউদিয়ার সঙ্গে মারাদোনার প্রায়ই ঝগড়া হত, মেয়েদের খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে। ডালমা আইসক্রিম খেতে চাইছে। ক্লাউদিয়া দেবেন না। এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে প্রচণ্ড চেঁচামেচি। বাড়ির পাঁচিলে লেন্স লাগিয়ে বসে-থাকা ফোটোগ্রাফার দু'জনের ঝগড়ার ছবি তুলবেন বলে উঁকিঝুঁকি মারছিলেন। এমন সময় তা দেখে মারাদোনা বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে এলেন। ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখালেন ফোটোগ্রাফারকে। একজনকে মারধোরও করলেন। এ নিয়ে মামলা হল। সে এক চরম অশান্তি। বাইরে তিনি যত বিদ্রোহীই হোন না কেন, ঘরে কিন্তু মারাদোনা স্নেহশীল পিতা। মেয়েদের খাইয়ে-দাইয়ে স্কুলে পাঠানো থেকে শুরু করে, ছুটিতে ডিজনিল্যান্ড নিয়ে যাওয়া—সবই করেন। খিয়ানিনি রোজ দুপুরে স্কুল থেকে বাড়িতে খেতে আসে। আবার স্কুলে যায়। দু'-একদিন ফিরতে দেরি হয়ে যায়। এ নিয়ে স্কুলের শিক্ষকরা চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি পেয়ে মারাদোনা রেগে লাল। শিক্ষকদের এত সাহস! আমার মেয়ে কখন স্কুলে যাবে, তা ওঁরা ঠিক করে দেবেন? স্কুলে গিয়ে তিনি যা-ইচ্ছে তা-ই বলে এলেন।

এই বদমেজাজ মারাদোনাকে সারা জীবন ভুগিয়েছে। কারও

boierpathshala.blogspot.com

সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল থাকেনি। বোকা জুনিয়র্স ক্লাব থেকে শুরু করে ফিফা, সিস্টার্সপিলার থেকে বিলার্ডো—সকলের সঙ্গেই কোনও না কোনও সময়ে মারাদোনার সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গিয়েছে। আলফিও বাসিলে তাঁকে প্রাক-বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ দিয়েছিলেন। সেজন্য দু'জনের মধ্যে সম্পর্কটা ছিল আদায়-কাঁচকলায়। কিন্তু ১৯৯৩ সালে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে আর্জেন্টিনা দল এত বাজে খেলতে শুরু করল যে, একটা সময় আর্জেন্টিনীয়দের মনে হল, মূলপর্বেই যেতে পারবে না। সেই সময় কাগজে কাগজে লেখা শুরু হয়ে গেল, ডিয়েগোকে জাতীয় দলে ফিরিয়ে আনা হোক। প্লে-অফ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যেদিন ড্র হল, সেদিন ক্লারিন জনমত যাচাই করেছিল। উকিল, লেখক, গির্জার যাজক থেকে শুরু করে গৃহবধূরাও সেদিন মত দেন, ডিয়েগোকে ফিরিয়ে আনা উচিত। বাসিলের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু জনমতের বিরুদ্ধে যাওয়ারও ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তিনি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোম ম্যাচে ডেকে নিলেন মারাদোনাকে। সেই ম্যাচ জিতে আর্জেন্টিনা মূলপর্বে গেল। সারা দেশ বিশ্বাস করল, না ডিয়েগো ফুরিয়ে যাননি।

আমেরিকায় বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে আর্জেন্টিনা দল ইউরোপ সফরে গেল। ২০ দিনের সফর। খেলবে ইজরায়েল, অস্ট্রিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সুইজারল্যান্ডে। সেখান থেকে সোজা বস্টন। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থা—আফা প্রচুর অর্থ খরচ করেছিল এই সফরের জন্য। যাত্রার প্রথম দিকেই ঝঞ্ঝাট। ইজরায়েল পৌঁছে মারাদোনা কাউকে কিছু না বলে জেরুজালেম চলে গেলেন। ইজরায়েলের লোকেরা এতে মনঃক্ষুণ্ণ হল। জেরুজালেম থেকে ফিরেই মারাদোনা সেই রাতে বাসিলের কাছে জানতে চাইলেন, টিমের কী হবে? কারা খেলবেন, তাঁর সঙ্গে? দলের সঙ্গে তেল আভিভ গিয়েছিলেন ২৩ জন। মারাদোনা বললেন, ২২ জন আগেই বেছে নেওয়া দরকার। পরের দিন সকালে বাসিলে জানালেন, দারিও ফ্রাঙ্কোকে দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। অন্য প্লেয়াররা এটা মানতে চাইলেন না। রোজারিও প্রদেশের ছেলে ফ্রাঙ্কো। রাষ্ট্রপতি মেনেম যে অঞ্চলের বাসিন্দা,

boierpathshala.blogspot.com

সেখানকার ছেলে। সফরে বেরোবার আগে তিনি সামান্য চোট পেয়েছিলেন। বাসিলে বললেন, "চোট পাওয়া প্লেয়ারকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে লাভ নেই। তার চেয়ে দেশে গিয়ে ও বিশ্রাম নিক।"

টিমে মারাদোনার বিরোধীরা কিন্তু সন্দেহ করলেন, ফ্রাঙ্কোর বাদ পড়ার পেছনে রয়েছেন মারাদোনা। দেশে চলে যাওয়ার আগে এই কথা নাকি অন্যদের বলে গেছেন ফ্রাঙ্কো। কথাটা শুনে মারাদোনা হঠাৎ খুব 'নার্ভাস' হয়ে যান। তেল আভিভ থেকে ফোন করেন বুয়েনস আইরেসে। জানতে পারেন, ফ্রাঙ্কোর মা খবরের কাগজে তাঁর সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছেন। শুনে তখন উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মারাদোনা। ম্যানেজার ফ্রাঞ্চিকে ডেকে বলেন, "গাড়ির ব্যবস্থা করো। আমি ভিয়েনায় যাব। সেখান থেকে বুয়েনস আইরেস।" ফ্রাঞ্চি তখন বোঝাতে থাকেন, এটা করা ঠিক হবে না। টিমের পক্ষে তা মারাত্মক ক্ষতিকারক হবে। মারাদোনার রাগ আরও বাড়তে থাকে, "ওই মহিলা কী ভেবেছেন নিজেকে? আমাকে দায়ী করছেন? আমি কি একটা পাঁঠা যে, আমাকে বলি দিচ্ছেন? ফ্রাঙ্কোকে বাদ দিলেন বাসিলে। আর দোষ হচ্ছে আমার?" মারাদোনার মেজাজ দেখে অন্য সবাই তখনকার মতো চুপ করে যান। ফ্রাঞ্চি কিন্তু লেগে রইলেন। মাথা ঠাণ্ডা করলেন মারাদোনার। ফ্রাঞ্চি বললেন, "এখানে যাই ঘটুক না কেন, তোমাকে খেলে দেখাতে হবে, তুমি বড় ফুটবলার।"

মারাদোনা বললেন, "খেলব কী, পুরো দলটার অবস্থা তো এখন মরা মশার মতো। উৎসাহ দিতে গেলাম। উলটে এখন আমাকেই দোষারোপ করছে। কে ঢোকাল ফ্রাঙ্কোর মায়ের মাথায়, ওকে আমি বাদ দিয়েছি? গ্রোন্দোনা? না অন্য কেউ। তার নামটা আমার জানা দরকার।" আফা-র প্রেসিডেন্ট গ্রোন্দোনা তখন বললেন, "ফ্রাঙ্কোর বাদ পড়া নিয়ে কিছু মনে রাখার দরকার নেই। এটা নিয়ে মারাদোনা যেন চিন্তা না করে।" গ্রোন্দোনার এই কথা শুনে মারাদোনা শান্ত হন।

কিন্তু তেল আভিভ থেকে বিমানে প্যারিস যাওয়ার পথে আবার একটা ঘটনা ঘটল। প্লেয়ারদের জন্য টিকিট কাটা হয়েছিল টুরিস্ট

boierpathshala.blogspot.com

ক্লাসের। বিলার্ডোর আমলে প্লেয়াররা সবসময় চড়তেন এক্সিকিউটিভ ক্লাসে। আসন দেখে তো মারাদোনা ফের বিদ্রোহ করলেন। বিমান আকাশে ওড়ার পর দলবল নিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন প্যাসেজে। বিমান সেবিকারা অনুরোধ করতে এলে তিনি দুর্ব্যবহার করলেন তাঁদের সঙ্গে। অন্য যাত্রীদের অসুবিধে হচ্ছিল। তাঁরা প্রতিবাদ করলেন। খবর পৌঁছে গেল পাইলটের কাছে। তিনি এসে বললেন, আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা যদি নিজেদের আসনে গিয়ে না বসেন, তা হলে বিমান ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তেল আভিভে। হার স্বীকার করা মারাদোনার চরিত্রে নেই। বললেন, তাঁর পেট খারাপ হয়েছে, সেজন্য শুয়ে থাকবেন। মারাদোনার অভব্য আচরণ দেখে আর্জেন্টিনা শিবির দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্যারিসে নেমে আর্জেন্টিনার কিছু প্লেয়ার বেঁকে বসেন। তাঁরা বাসিলে এবং টিমের ডাক্তার উগালডেকে বললেন, মারাদোনা যদি এই আচরণ করতে থাকেন, তা হলে তাঁরা সহ্য করবেন না।

আমেরিকায় পৌঁছনোর আগেই আর্জেন্টিনা দলের কর্তারা বুঝে ফেলেন, মারাদোনাকে টিমে নেওয়া কত বড় ভুল হয়েছে। টিম অস্ট্রিয়ায় একটা ম্যাচ খেলে যাচ্ছিল ক্রোয়েশিয়ায়। রাতে বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল। ভোর রাতে একটা চেক পোস্টে মারাদোনা হঠাৎ নেমে পড়লেন। দাবি তুললেন, আলাদা গাড়িতে যাবেন। তাঁকে দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল, সারারাত ঘুমোননি। ছটফট করেছেন। প্লেয়ারদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল, মাদকাসক্তির লক্ষণ। টিমের সঙ্গে মারাদোনা যেতে চাইছেন না, একটাই কারণে। আলাদা গাড়িতে গেলে কোকেন নিতে পারবেন। চেক পোস্টে যখন গাড়ির খোঁজ চলছে, তখন হঠাৎ ক্রোয়েশিয়ার এক পুলিশকে ঘুসি মেরে বসেন মারাদোনা। পুলিশ পুরো দলকে আটকে দেয়। ক্রোয়েশিয়া তখন নতুন দেশ। তাই বাড়াবাড়ি করেনি। অন্য কোনও দেশ হলে মারাদোনাকে ছেড়ে দিত না। সেদিন খেলায় অবশ্য মারাদোনা একেবারেই মন দিতে পারলেন না। গ্যালারি থেকে অনেকেই তাঁকে বিদ্রূপ করলেন। ফ্রাঞ্চি নিজেও খুব শঙ্কিত বোধ করলেন, প্রীতি ম্যাচেই যদি এই অবস্থা

boiepathshala.blogspot.com

হয়, তা হলে বিশ্বকাপে মারাদোনা কী করবেন ?

আর্জেন্টিনা দলের বস্টন পৌঁছনোর কথা ছিল ৫ জুন। প্রথমে এক সপ্তাহ তারা একটা হোটেলে থাকবে। তারপর চলে যাবে ব্যবসন কলেজের ক্যাম্পাসে। তিনটে মাঠ আছে ওই কলেজে। বিরাট জিমনাশিয়াম। নাচের হল। সেইসঙ্গে একটা অ্যাথলেটিক্স ট্র্যাক। এই ক্যাম্পাসটা চার সপ্তাহের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন আফা প্রেসিডেন্ট গ্রোন্দোনা। খেলার সূচি তৈরি হওয়ার পর তিনি হিসেব করে নেন, আর্জেন্টিনাকে বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে হবে ফক্সবোরো স্টেডিয়ামে। তার কাছাকাছি থাকাটাই ভাল। চারদিক গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা। লোকালয়ের কিছুটা বাইরেও। বিশ্বকাপের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ছুটি। তাই আর্জেন্টিনা দল নিশ্চিন্তে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পেল।

ব্যবসন কলেজে আসার আগে টিমের ভেতর কয়েক দিনের জন্য বিভেদটা মুছে গিয়েছিল একটা অলৌকিক ঘটনায়। ক্রোয়েশিয়া থেকে রওনা হওয়ার পরই আকাশে বিমানে গণ্ডগোল দেখা দেয়। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে আর্জেন্টিনা দলের প্লেয়ারদের মধ্যে। সবাই ধরে নেন, আর বাঁচবেন না। সবাই মিলে ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রার্থনা শুরু করেন। মারাদোনা সেদিন এত ভয় পেয়ে যান, ক্যানিজিয়াকে সারাক্ষণ আঁকড়ে ধরে বসে ছিলেন। বারবার তিনি নাকি বলেন, "এভাবে আমি মরতে পারি না। আমি যদি মরি, তা হলে আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে একসঙ্গে মরব।" প্লেনের পাইলট ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করে সেদিন দুর্ঘটনা এড়ান। দলের ডাক্তার উগালডে সেদিনই প্রথম লক্ষ করেন, মারাদোনা স্নায়ুর রোগে ভুগছেন। কোকেন তাঁকে শেষ করে দিয়েছে। তাঁর চিকিৎসা দরকার।

ব্যবসন কলেজে যাওয়ার আগে আর্জেন্টিনা দল যখন বস্টনের হোটেলে ছিল, সেই সময় দুই মেয়েকে নিয়ে হাজির হন ক্লাউদিয়া। বাসিলে কোনও প্লেয়ারের স্ত্রীকে অনুমতি দেননি, একই হোটেলে থাকার। কিন্তু ক্লাউদিয়াকে তিনি না করতে পারলেন না। এ নিয়ে অন্য ফুটবলাররা অসন্তুষ্ট হলেন। বাসিলে আর গ্রোন্দোনা ঠিক করে দিয়েছিলেন, তাঁদের অনুমতি ছাড়া

boiepathshala.blogspot.com

কোনও প্লেয়ার কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। কিন্তু মারাদোনা তা মানার ধারেকাছেই গেলেন না। তিনি ক্লাউদিয়া বা মেয়েদের সঙ্গে কখন দেখা করবেন, সেটা তাঁর নিজের ব্যাপার। কেউ যেন তাঁর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করেন। এই সময়ই তিনি হোটেলে নিয়ে এলেন নতুন একজনকে—ড্যানিয়েল সেরিনি। ফিজিওথেরাপিস্ট। গ্রোন্দোনাকে বললেন, "টিমের ডাক্তার উগালডেকে আমার দরকার নেই। উনি বাকি সব প্লেয়ারের দেখাশোনা করুন। সেরিনি আমার সঙ্গে কাজ করবে।" এর দু'দিন পর হোটেলে উদয় হলেন আর একজন—সালভাতোরে কার্মান্দো। নাপোলি ক্লাবের ম্যাসিওর। মারাদোনা এঁকে খুব পছন্দ করতেন। তাই খরচ দিয়ে নাপোলি থেকে উড়িয়ে আনলেন তাঁকে।

বস্টনে প্রচুর আর্জেন্টিনীয়র বাস। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে অনেকে এসে ওঠেন খেলা দেখার জন্য। বস্টনে একটা বাজার আছে—কিনয়। অনেকটা বুয়েনস আইরেসের লা রিসোলেতার বাজারের মতো। প্রচুর রেস্তরাঁ, মিউজিক হল। আর্জেন্টিনার সমর্থকরা ওখানেই গিয়ে ভিড় করতেন। বিশ্বকাপের সময় আমি নিজেও বস্টনে দেখেছি, সমর্থকদের গায়ে মারাদোনার ১০ নম্বর জার্সি। সবার আগ্রহ ডিয়েগোকে নিয়ে। সেরিনি কী বলছেন, গ্রোন্দোনা কী ভাবছেন, ডিয়েগো কী চাইছেন—এসব নিয়ে আলোচনা। একদিন শুনলাম, প্লেয়ারদের হয়ে মারাদোনা প্রথম তিনটে ম্যাচের জন্য পনেরো লাখ ডলার চেয়েছেন। অন্য দিন শুনলাম, সেরিনি বলেছেন, "মারাদোনা যে শান্তিটা খুঁজছিল, এখানে এসে তা পেয়েছে। পুরনো ফর্মে খেলবে মারাদোনা।" সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসের ধ্বনি সমর্থকদের মধ্যে। টিমের কারও কাছে কী শুনে এসেছেন আর একজন। তাঁকে ঘিরে জটলা। মারাদোনা নাকি বলেছেন, "আমি জানি, আমি ফিরে আসছি। ফের পা এবং হৃদয় দিয়ে আমি সকলের মন জয় করে নেব।"

প্রথম ম্যাচ গ্রিসের বিরুদ্ধে। তার আগের দিন ব্যবসন কলেজের মাঠে আর্জেন্টিনার প্র্যাকটিস দেখতে গেলাম। সঙ্গে সের্জেই। বিলার্ডোর আমলে যা প্র্যাকটিস দেখেছিলাম, বাসিলের

boierpathshala.blogspot.com

আমলেও তা অব্যাহত। কারও মধ্যে সিরিয়াসনেস নেই। মাঠের চারপাশে সাংবাদিক আর ফোটোগ্রাফারদের ভিড়। ঘুরে ঘুরে তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন মারাদোনা। বলে পা পর্যন্ত দিলেন না। বাতিস্তুতা-সিমোনেরা একটা জায়গায় 'পাসিং' প্র্যাকটিস করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে হাসি-মস্করা করে মারাদোনা অন্য দিকে চলে গেলেন। ভিড়ের মাঝখান থেকে সের্জেই একবার বেরিয়ে এসে বলল, "কাল রাতে বাসিলের সঙ্গে মারাদোনার ঝামেলা হয়ে গেছে।" কী ব্যাপার? ও বলল, "বাসিলে ফার্স্ট ইলেভেনে গোয়কোচিয়াকে খেলাবেন না। গোলকিপার পজিশনে নামাচ্ছেন লুইস ইসলাসকে। এ নিয়ে জোর অশান্তি চলছে।"

সেদিনই জানতে পারলাম, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলে যেমন দলবাজি হয়, বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ানদের টিমেও তেমন দলবাজি আছে। মারাদোনা খুব পছন্দ করেন গোয়কোচিয়া, মানকুসো আর সিমোনেকে। আর দু'চোখে দেখতে পারেন না রোদোন্দোকে। কেন? না, রেদোন্দো একবার কলেজের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য জাতীয় টিমে চান্স পেয়েও খেলতে যাননি। লেখাপড়াটা কি ফুটবলের চেয়েও বড়? প্রচণ্ড রেগে সেদিন মারাদোনা প্রতিজ্ঞা করেন, "এই ছেলেটাকে আমি কোনওদিন ক্ষমা করতে পারব না।" রেদোন্দো, বালবো, চামট—এঁরা মারাদোনার কাছাকাছি আসতেন না। এদিকে, ক্যানিজিয়ার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বাতিস্তুতার। কেউ কারও মুখ দেখতেন না। এই সেই বাতিস্তুতা, জাতীয় দলের হয়ে গোল করায় পরে মারাদোনার রেকর্ড ভেঙে দেন।

এমন যেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক, সেখানে একটা টিমের চ্যাম্পিয়ান হওয়া মুশকিল। গ্রিস ম্যাচের আগেই চূড়ান্ত গণ্ডগোল লাগল ড্যানিয়েল ওর্তেগাকে নিয়ে। সেই সময় ওর্তেগাকে মারাদোনার উত্তরসুরি ভাবা হচ্ছিল। তখন খেলেন রিভারপ্লেট ক্লাবে। কোচ পাসারেল্লার হাতে তৈরি। ব্যবসন কলেজ কমপ্লেক্সে ওর্তেগাকে বাসিলে রেখেছিলেন মারাদোনার পাশের ঘরে। এটা জানতে পেরে পাসারেল্লা তাঁর ক্লাবের প্রেসিডেন্টের হাত দিয়ে একটা চিঠি পাঠালেন, "ওর্তেগার ঘরটা বদলে দিন।

boierpathshala.blogspot.com

মারাদোনার পাশের ঘরে থাকলে ও নষ্ট হয়ে যাবে। এমন একজনের পাশে ওর থাকা দরকার যে ওকে গাইড করবে।" পাসারেল্লা তখন আমেরিকায়। ইতালি টিমের সঙ্গে রয়েছেন। কোচ অ্যারিগো সাক্কির সঙ্গে তাঁর খুব দোস্তি। তিনি মনেপ্রাণে চাইছেন, ইতালি টিমটা চ্যাম্পিয়ান হোক। পাসারেল্লার চিঠি পেয়ে গ্রোন্দোনা পড়লেন মহা ফাঁপরে। ওর্তেগাকে অন্য কোনও ঘরে সরিয়ে দিলে, মারাদোনার কানে তা যাবে। এবং পুরো রাগটা গিয়ে পড়বে তাঁর ওপর।

গ্রিস ম্যাচের আগে অজ্ঞাত কারণে ইতালির কাগজগুলো হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল মারাদোনা সম্পর্কে। এটা এখনও আমার কাছে রহস্য। যে কাগজটা মারাদোনার সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি লিখত, সেই 'গেজেত্তা দে লা স্পোর্ট্স' লিখল, "এই সেই বিখ্যাত পা, যা ১০০ বছরে একটা মাত্র দেখা যায়। আবার সেই পা এবারের বিশ্বকাপে নামতে চলেছে। ডিয়েগো কল্পনায় এতদিন আমাদের যা দেখিয়েছে, সেটা বাস্তব হতে চলেছে। এটা সিনেমার ছবির মতোই আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।" ফ্রান্সের লা ইকিপ লিখল, "ফুটবলের রাজা আবার তার 'ফিনিশিং টাচ' দেখাতে নামছেন। মারাদোনা 'হিরো' ছিলেন। প্রমাণ করতে যাচ্ছেন, এখনও তিনি হিরো।" ওই সময় মারাদোনার প্র্যাকটিস দেখে বোকা জুনিয়র্সের কর্তারা পর্যন্ত ধোঁকা খেয়ে যান। তাঁরা প্রাথমিক কথাবার্তা বলে নিলেন, দেশে ফিরে গিয়েই ডিয়েগো তাঁদের ক্লাবে যাতে সই করতে পারেন। এই কথাগুলি বোকা-র হয়ে বলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কার্লোস হেলার। মারাদোনার সঙ্গে এঁর খুব সুন্দর সম্পর্ক। মারাদোনা স্বীকার করতেন হেলার একমাত্র ক্লাব-কর্তা, যিনি ফুটবলটা বোঝেন।

গ্রিস ম্যাচে কিন্তু মারাদোনাকে ছাপিয়ে যান বাতিস্তুতা। খেলার সময় সমর্থকরা মারাদোনার নাম ধরে চিৎকার করছিলেন। কিন্তু সেদিন বাতিস্তুতা গোল করার পর সেই চিৎকারটাই বদলে যায় বাতিস্তুতার নামে। এটা পছন্দ করলেন না মারাদোনা। তাঁর নামের সঙ্গে আর একটা নাম উচ্চারিত হোক, এটা কী করে তিনি বরদাস্ত করবেন ? সেদিন খেলার পর 'ডোপ' পরীক্ষার জন্য নিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

যাওয়া হল গোয়কোচিয়া আর বালবোকে। ডোপ নিয়ন্ত্রণের জন্য বস্টনে সেদিন হাজির ছিলেন ফিফার মেডিকেল কমিশনের অ্যালান ফ্রিটন। তিনি একটা ব্যাপার লক্ষ করেন, মারাদোনা নিজে গোল করার পর দৌড়ে যান টিভি ক্যামেরার দিকে। মুখ ভেঙিয়ে। ওই দৃশ্যটা দেখার পর ফ্রিটনের সন্দেহ হয়। কোনও সুস্থ ফুটবলারের পক্ষে ওরকম মুখব্যাদান করে দৌড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক। ওই দৌড়ই মারাদোনার জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়।

ফক্সবোরো স্টেডিয়ামে সেদিন খেলা দেখার জন্য হাজির ছিলেন যোহান ক্রুয়েফ। তিনি বলে ফেললেন, "৩৪ বছর বয়সে বিশ্বকাপে এসে এমন খেলা একমাত্র সম্ভব মারাদোনার পক্ষেই। তবে এটাও ঠিক, গ্রিসের মতো দুর্বল টিমও প্রথম ম্যাচে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার।" খেলার পর মারাদোনা আর বাসিলে প্রেস-কনফারেন্সে এসে বললেন, "পুরো টিম দুর্দান্ত খেলেছে।" মারাদোনা বললেন, "আমার গোলটা আমি মেয়েদের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি। তবে গ্রিসকে ছোট করতে চাই না। আর্জেন্টিনাকেও বড় করছি না।" গ্রিসের কোচ আলকেটাস বললেন, "আমরা বস্টনে এসেছি, আর্জেন্টিনা টিমের সঙ্গে ছবি তোলার জন্য। যুদ্ধ করতে আসিনি।" বাসিলে বললেন, "আমরা চ্যাম্পিয়ান হতে এসেছি। প্রত্যেক ম্যাচে 'সারপ্রাইজ' দেব।"

বাসিলে তখন নিজেও জানতেন না, কী বিস্ময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে!

॥ ১২ ॥

আর্জেন্টিনার দ্বিতীয় ম্যাচের দিনও ডালাসের স্টেডিয়ামে আমি হাজির ছিলাম। সেদিন ক্যানিজিয়াকে দিয়ে মারাদোনা যে গোলটা করিয়েছিলেন, তা সারাজীবন মনে রাখব। ম্যাচটা নাইজিরিয়া ২-১ গোলে হারার পর, প্রেস-কনফারেন্সে গেলাম। সেদিন ডালাসে প্রচণ্ড গরম। একটা হলঘরে দাঁড়িয়ে আমরা দরদর করে ঘামছি। সাধারণত, খেলা শেষ হওয়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই দু' টিমের কোচ আর ক্যাপ্টেন প্রেস-কনফারেন্সে এসে পড়েন।

boierpathshala.blogspot.com

সেদিন প্রায় ৪৫ মিনিট কেটে গেল, তবুও বাসিলে বা মারাদোনা কারও পাত্তা নেই। হঠাৎ আমরা দেখলাম, একটা মেয়ে-অ্যাটাশের সঙ্গে মারাদোনা হাঁটতে হাঁটতে আসছেন। আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন 'ডোপ কন্ট্রোল রুম'-এর দিকে। ভিড়ের মাঝখান থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "ডিয়েগো, কখন আসছ ?" মারাদোনা ইশারায় বললেন, এখনই। খানিকক্ষণ পর আর্জেন্টিনারই এক সাংবাদিক ঠাট্টা করে বললেন, "ডোপ পরীক্ষা দিতে গেল। দেখো, আবার কোনও কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে না পড়ে।" কথাটা শুনে আশপাশের অনেকে হেসে উঠলেন। একজন প্রতিবাদ করে বললেন, "আরে, না, না। নিজেকে ও অনেক বদলে ফেলেছে।"

এই বদলে ফেলার কথাটা অনেকেই তখন বিশ্বাস করে ফেলেছেন। ফিজিক্যাল ট্রেনার ড্যানিয়েল সেরিনির প্রশংসায় তখন সবাই পঞ্চমুখ। সেভিয়া ক্লাব থেকে ফিরে আসার পর মারাদোনা শরীরের ওজন অনেক বাড়িয়ে ফেলেন। সেরিনি তাঁর ওজন কমিয়ে, একেবারে 'ফিট' করে দেন। এই সেরিনির সঙ্গে মারাদোনার পরিচয় ক্লাউদিয়া মারফত। ক্লাউদিয়ার এক বন্ধু হলেন সেরিনির স্ত্রী। মাত্র ২৭-২৮ বছর বয়স সেরিনির। নিজে বডি-বিল্ডার ছিলেন। তাঁর জিমনাশিয়ামে মাঝে-মধ্যে ক্লাউদিয়া শারীরচর্চা করতে যেতেন। প্রথম পরিচয়েই সেরিনি কথাবার্তায় মারাদোনাকে মুগ্ধ করে ফেলেন। বুয়েনস আইরেসে সেরিনির নিজস্ব ক্লাব নিউ এজ জিম। সেখানে মারাদোনা নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেন।

বিশ্বকাপের আগে সারা আর্জেন্টিনায় যখন দাবি উঠেছে মারাদোনাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তখন সেরিনি আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন মারাদোনার। তিনি বললেন, শরীরের ওজন আরও কমিয়ে ফেলা দরকার। এর জন্য নির্জন কোথাও গিয়ে একটা 'কোর্স' নিতে হবে। মারাদোনার আরও একজন ফিজিক্যাল ট্রেনার ছিলেন—সিগনোরিনি। সেই বার্সেলোনা ক্লাবে খেলার দিনগুলো থেকে। সেরিনির পরামর্শ মতো, সিগনোরিনিকে নিয়ে মারাদোনা চলে গেলেন গোপন ডেরায়। কিন্তু দুই ফিজিক্যাল

boierpathshala.blogspot.com

ট্রেনারের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে গেল, ওজন নিয়ে। মারাদোনার ওজন তখন ৯২ কেজি। সেরিনি নামিয়ে আনতে চাইলেন ৭০ কেজি-তে। সিগনোরিনি বললেন, ৭০ কেজি অনেক কম হয়ে যাবে। ওটা বিশ্বকাপের সময় রাখতে হবে ৭৭ কেজি-র কাছাকাছি। কেননা ওটাই আদর্শ ওজন মারাদোনার পক্ষে। বস্টনে গ্রিসের বিরুদ্ধে মারাদোনা যেদিন খেললেন, সেদিন তাঁর ওজন ছিল ৭৮ কেজি। খেলার পর তিনি সিগনোরিনিকে বলেন, "শরীরটা এত ফিট লাগছিল, যেন মনে হচ্ছিল বয়স ১০ বছর কমে গেছে।"

ডালাসে ডোপ পরীক্ষা দিয়ে, এক ঘণ্টা পর যখন মারাদোনা প্রেস-কনফারেন্সে এলেন, তখন বেশ হাসিখুশি এবং কথাবার্তায় আগের মতোই আক্রমণাত্মক। তিনি এমনও বললেন, "যে রেফারিটা আজ আমাদের ম্যাচ খেলাল, তাকে এখনই প্লেনে করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।" তখন তিনি জানতেনও না, দেশে ফেরার প্লেন তাঁকেই ধরতে হবে। বিশ্বকাপে শেষ ম্যাচটা তিনি খেলে ফেলেছেন। প্রেস কনফারেন্সে কোচ বাসিলে সারাক্ষণ গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। কেন, তখন আমরা তা বুঝতে পারিনি। তবে সেদিন বাসিলের একটা কথা মনে আছে, "ডালাসে বালগারিয়া ম্যাচটা আমাদের পক্ষে জেতা কঠিন হয়ে গেল।" কী আন্দাজ করে বাসিলে তখন ওই কথাটা বলেন, কে জানে? কথা উঠল মারাদোনার দুর্দান্ত পাস আর ক্যানিজিয়ার গোল নিয়ে। একজন মজা করে বললেন, "আপনি যেভাবে ক্যানিজিয়াকে দিয়ে গোলটা করালেন, তাতে মনে হল ওর 'মেশিন'টা আপনিই 'কন্ট্রোল' করছেন।" মারাদোনা হাসতে হাসতে বললেন, "শুধু ক্যানিজিয়ার মেশিন?" বলেই তিনি তির্যক চোখে তাকালেন বাসিলের দিকে। অর্থাৎ বাসিলেকেও তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। ওই প্রেস-কনফারেন্সেই আমরা জানতে পারলাম, ক্যানিজিয়ার গোলটা বিশ্বকাপের ইতিহাসে লেখা থাকবে। কেননা ওটা বিশ্বকাপের ১৫০০তম গোল।

মারাদোনার ডোপ পরীক্ষা হয়েছিল জুরিখে। তাঁর মূত্র নমুনায় যে 'এফিড্রিন' পাওয়া গেছে, এটা প্রথম জানতে পারেন আফা-র

boierpathshala.blogspot.com

প্রেসিডেন্ট খুলিও গ্রোন্দোনা। ডালাসের এক রেস্তরাঁয় বসে তখন তিনি ডিনার সারছেন এক বন্ধুর সঙ্গে। মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন জুরিখ থেকে ফিফার এক কর্তা। সঙ্গে সঙ্গে খাবারের টেবিল ছেড়ে তিনি চলে যান, যাতে ফোনে কথাবার্তা আর কেউ শুনতে না পারেন। ডিয়েগো ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েছে শোনার পর তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। ও প্রান্তে কথা বলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ফিফার সচিব জোসেফ ব্লাটার। তিনি বললেন, "কী করব, আপনি বলুন। ডিয়েগোকে সাসপেন্ড করা ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কোনও উপায় নেই।" গ্রোন্দোনা তখন আর কী বলতে পারেন। বললেন, "জানি, আমার টিম শেষ হয়ে গেল। এই ধাক্কাটা সামলাতে পারবে না। তবুও বলছি, আপনারা যা ভাল মনে করবেন, করুন।"

মারাদোনার কাছে খবরটা পৌঁছে দেন সিগনোরিনি। তখন গভীর রাত। ডালাসের হোটেলে মারাদোনা ঘুমিয়ে রয়েছেন। ঘরে ঢুকে সিগনোরিনি তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, "ডোপ পরীক্ষায় তুমি ধরা পড়েছ। ওরা তোমাকে সাসপেন্ড করবে।" কথাটা শুনে মারাদোনা নাকি প্রথমে বুঝতেই পারেননি। তারপর তিনি বলে ওঠেন, "এত কষ্ট করে ট্রেনিং করলাম। আর ওরা আমার সঙ্গে এই ব্যবহার করছে?" দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা আর্জেন্টিনা শিবিরে। সহখেলোয়াড়রা কেউ সহানুভূতি দেখাতে এগিয়ে এলেন। কেউ আবার রাগে ফেটে পড়লেন। এই একটা লোকের জন্য তাঁদের বিশ্বকাপ জেতার সম্ভাবনা শূন্যে নেমে গেল। পুরস্কার অর্থ, বোনাস, স্পনসর, ইউরোপের ক্লাবে খেলার আমন্ত্রণ—অনেক কিছু জড়িয়ে ছিল বিশ্বকাপে তাঁদের পারফরম্যান্সের ওপর। কোনও কিছুই আর জুটবে না।

খোঁজ করা শুরু হল, মারাদোনার শরীরে এফিড্রিন গেল কী করে? টিমের ডাক্তার উগালডেকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, "ডিয়েগো আমার কাছে আসতই না। তাই বলতে পারব না, এখানে এসে কী ওষুধ খেয়েছে।" তখন সিগনোরিনিকে ডেকে জানতে চাওয়া হল। তিনিও বললেন, কোনও ওষুধ এনে

boierpathshala.blogspot.com

দেননি। বস্টন পৌঁছনোর আগে আর্জেন্টিনা দলের প্রত্যেক ফুটবলারকে দু-একদিন পর-পর মেডিকেল চেক আপ করাতেন ডাঃ পেড্রো। তিনি মারাদোনার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন, দু-তিনদিন আগে কাউকে না জানিয়ে মারাদোনা র‍্যাপিড ফুয়েল নামে একটা ওষুধ খেয়েছিলেন। ঠান্ডা-গরমে সর্দি হয়েছিল। তখন বস্টনের এক ওষুধের দোকান থেকে র‍্যাপিড ফুয়েল এনে দেন সেরিনি। আসলে এটা এক ধরনের কাফ সিরাপ। বুয়েনস আইরেসেও পাওয়া যায়। সিরাপের বোতলটা নিয়ে আসা হল। দেখা গেল, তাতে এফিড্রিন রয়েছে। বোতলের গায়ে লেখা ফর্মুলাটা সেরিনি পড়ে দেখেননি। তিনিই এই মারাত্মক ভুলটা করে ফেলেছেন।

ডোপ কেলেঙ্কারির খবরটা শুনে যাঁরা মারাদোনাকে দোষারোপ করছিলেন, তাঁদের রাগ গিয়ে পড়ল সেরিনির ওপর। কেন তিনি টিমের ডাক্তারকে না জানিয়ে ওষুধ দিতে গেলেন? তখনই আবিষ্কার হল, সেরিনির কোনও ডাক্তারি ডিগ্রি নেই। ফিজিক্যাল ট্রেনিং আর ডায়েটিংয়ের ওপর তিনি যে ডিপ্লোমা নেওয়ার কথা বলেছিলেন, তা সব ভুয়ো। তাঁর নিউ এজ জিমনাশিয়ামের একজন মেয়ে বডি-বিল্ডার একবার ডোপ পরীক্ষায় ধরা পড়েছিল। সেরিনিকে ডেকে আনতে লোক পাঠালেন গ্রোন্দোনা। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। সকালে খবরটা শুনেই তিনি নাকি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন। এই খবরটা জানাজানি হতেই সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সেরিনির ওপর। বুয়েনস আইরেসে তাঁর জিমনাশিয়ামে ভাঙচুর হয়ে গেল। কাগজে এমনও লেখা হল, সেরিনি আসলে সি আই এ-র এজেন্ট। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে শামিল ছিলেন। কেউ বললেন, দুষ্কর্মটা করেই তিনি মেক্সিকোয় চলে গেছেন। কেউ বললেন, না, তিনি রয়েছেন ফ্লোরিডায়। মোট কথা, সেরিনি খলনায়ক হয়ে গেলেন আর্জেন্টিনায়।

ডালাসে সেদিন সেরিনিকে পেলে আর্জেন্টিনার সমর্থকরা খুন করে ফেলতেন। মারাদোনা তাঁদের চোখে নির্দোষ। মনে আছে, ফিফার মেডিকেল কমিশনের সভার পর জোসেফ ব্লাটার যখন

boierpathshala.blogspot.com

প্রেস-কনফারেন্সে বলছেন, মারাদোনাকে ১৫ মাস নির্বাসন দেওয়ার কথা, তখন জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ এক মিনিটের জন্য সেখানে এসেই ফের উঠে যান। পরে শুনেছি, হ্যাভেলাঞ্জ নাকি চাননি, বিশ্বকাপের মধ্যেই শাস্তির কথা ঘোষণা করতে। ডোপ পরীক্ষার নিয়ম হল, প্রথমবার কেউ যদি অনুত্তীর্ণ হন, তাঁকে সেটা জানানো হয়। তারপর তাঁর উপস্থিতিতেই দ্বিতীয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সেই খেলোয়াড় যদি না থাকতে পারেন, তা হলে তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠাতে পারেন। মারাদোনার ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় পরীক্ষাটা হয়েছিল লস অ্যাঞ্জিলেসে। জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ এই দ্বিতীয় পরীক্ষাটাই কিছুদিন পিছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের কর্তারা তাতে আপত্তি করেন। বিশেষ করে, জার্মানি আর বেলজিয়ামের কর্তারা। তাঁরা ব্লাটারকে বোঝান, মারাদোনা নির্দোষ কিনা, তা জানার দরকার নেই। ঘটনা হল, তাঁর মূত্রে এফিড্রিন পাওয়া গেছে। সেজন্যই তাঁকে শাস্তি দেওয়া দরকার।

বেলজিয়াম আর জার্মানির কর্তারা চাপ দিয়েই সেদিন ব্লাটারকে বাধ্য করেন, মারাদোনাকে সাসপেন্ড করতে। তাঁদের স্বার্থ ছিল। কারণ, পরবর্তী রাউন্ডে আর্জেন্টিনার সঙ্গে তাঁদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। মারাদোনা সমেত আর্জেন্টিনা যতটা শক্তিমান, মারাদোনাহীন টিম ততটাই দুর্বল। সেদিনই সন্ধেবেলায় হঠাৎ খবর এল মারাদোনা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চান। সের্জেই লেভেনস্কির সঙ্গে আমিও দৌড়লাম হিলটন হোটেলে। রাত তখন দশটা-সাড়ে দশটা। হোটেলের লবিতে গিয়ে দেখলাম, জনা তিরিশেক সাংবাদিক হাজির। লিফ্‌টে করে নীচে নেমে এলেন মারাদোনা। সঙ্গে মার্কেস ফ্রাঞ্চি। সেদিন কাঁদতে কাঁদতে সাংবাদিকদের তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে, করাত দিয়ে কে যেন আমার দু'টো পা কেটে নিয়েছে। বিশ্বাস করুন, আমি নির্দোষ।" আমার মতো সবাই সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন, মারাদোনার দোষ নেই।

মারাদোনাকে সেদিনই শেষবারের মতো দেখি। মাঝে চার বছর কেটে গেছে। এখনও আমার ধারণা বদলায়নি। মারাদোনা এখন কিংবদন্তির পর্যায়ে চলে গেছেন। খেলা ছেড়ে দেওয়ার

boierpathshala.blogspot.com

পরও তিনি প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজের শিরোনামে। প্রায় দিনই তিনি বিতর্কে। মাঝে-মধ্যে ভাবি, তিনি কী এমন করেছেন, যা অন্য সুপারস্টার ফুটবলাররা করেননি ? বুয়েনস আইরেসে তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিরক্ত করার জন্য মারাদোনা এক সাংবাদিককে গুলি করে ভয় দেখিয়েছিলেন। এই দুষ্কর্মটি লোথার ম্যাথুজ করেননি ? তিনিও তো আমস্টারডাম বিমানবন্দরে এক ডাচ সাংবাদিককে ঘুসি মেরেছিলেন। মারাদোনা একবার বিলার্ডোর সঙ্গে মারপিট করেছিলেন। রুড গুলিট করেননি ? তিনিও তো ডাচ কোচ বিনহাক্কারকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছিলেন। স্তোইচকভ, গাসকয়েন, এরিক কতোঁনা, রাইকার্ড, রোমারিও— এঁরাও কি মারাদোনার মতো একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েননি ? তা হলে একা মারাদোনা কেন এত নিন্দিত হবেন ? ফুটবল-কর্তাদের সঙ্গে কোনওদিনই মারাদোনার সদ্ভাব ছিল না। না থাকাটাই স্বাভাবিক। প্রতিভাবানরা কখনও কাউকে তোয়াজ করে চলতে পারেন না। কর্তারা মনে করেন, তাঁরা আছেন বলেই ফুটবলাররা রয়েছেন। আর মারাদোনারা ভাবেন, তাঁরা আছেন বলেই কর্মকর্তাদের এত রমরমা। লোকে তাঁদের দেখার জন্যই মাঠে ছুটে আসেন, কর্মকর্তাদের নয়। গল্‌ফ আর টেনিস খেলোয়াড়রা যদি নিজেদের সংস্থা গড়ে কর্মকর্তাদের চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেন, তা হলে ফুটবলাররাই বা পারবেন না কেন ? বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা ফুটবল। ফুটবলারদের পক্ষেই সম্ভব ফিফার একনায়কতন্ত্রে আঘাত হানা।

পেলে, বেকেনবাউয়ার আর প্লাতিনির ওপর মারাদোনার রাগ সবচেয়ে বেশি। কেননা, তাঁর মতে, এই তিনজন ফিফা-কর্তাদের চাটুকারিতা করে যাচ্ছেন। ফিফার কাছ থেকে কাজ বাগিয়ে নিচ্ছেন। আর নিজের দেশের লোকদের কাছে জনপ্রিয় হচ্ছেন। যেমন প্লাতিনি আদায় করে নিয়েছেন বিশ্বকাপ। বেকেনবাউয়ার আর ববি চার্লটন চেষ্টা করে যাচ্ছেন দু'হাজার ছয় সালের বিশ্বকাপের জন্য। নিজে সাসপেন্ড হওয়ার পর থেকেই মারাদোনার প্রচণ্ড রাগ ফিফা-কর্তাদের ওপর। তিনি ইউনিয়ন করার জন্য ফুটবলারদের ডাক দিলেন। ফুটবলারদের প্রথম সভা

boierpathshala.blogspot.com

ঠিক হল প্যারিসে। এরিক কতোঁনাও ইতিমধ্যে সাসপেন্ড হয়েছেন গ্যালারিতে দর্শকদের মারধোর করার কারণে। তাঁর দেশে সভা। চিঠি গেল ফুটবলারদের কাছে। খবরের কাগজে খুব ভাল প্রচার পেল মারাদোনার এই উদ্যোগ। বুয়েনস আইরেস থেকে উড়ে এলেন মারাদোনা, একটু ভয়ে-ভয়েই। এই ভেবে, যদি খুব বেশি ফুটবলার না আসেন ? কিন্তু প্যারিসে পৌঁছে সভায় উপস্থিতির সংখ্যা দেখে মারাদোনা খুশি। একপাশে জর্জ উইয়া, অন্যপাশে কতোঁনা। মারাদোনা সভায় এলেন। বলা হল, রুড গুলিট আসতে পারেননি। কিন্তু তিনি ইউনিয়ন গড়ার ব্যাপারে সমর্থন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

ফুটবলারদের সভায় কী হয়, তা জানার জন্য কৌতূহল সারা বিশ্বে। জুরিখ থেকে ফিফা-কর্তারাও নজর রাখছিলেন। কতোঁনা প্রস্তাব করলেন, মারাদোনাকে প্রেসিডেন্ট করা হোক। তাতে কারও আপত্তি নেই। নতুন প্রেসিডেন্ট মারাদোনা বলতে উঠে একগুচ্ছ সমালোচনা করে গেলেন ফিফা-কর্তাদের। হাততালির বন্যা বয়ে গেল। এর পর বলতে উঠলেন কতোঁনা। তিনি বলতেই থাকলেন। দেড় ঘণ্টা ধরে কতোঁনার বক্তব্য শুনতে শুনতে মারাদোনা প্রথমে বিরক্ত, তারপর রেগে গেলেন। এত ধৈর্য তাঁর নেই। মঞ্চ ছেড়ে তিনি উঠে পড়লেন। জুরিখে বসে ফিফা-কর্তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। প্রথমদিনই যদি প্রেসিডেন্ট আর সচিবের মধ্যে এই সম্পর্ক হয়, তা হলে সেই ইউনিয়নের শেষপর্যন্ত কী পরিণতি হবে তা বোঝা যাচ্ছে।

মারাদোনা বারপাঁচেক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রত্যেকবারই ফুটবল মাঠে ফের ফিরে এসেছেন। কোনওবার বাবার অনুরোধে, কোনওবার মেয়ের। কোনওবার প্রেসিডেন্ট মেনেমের নির্দেশে। এখনও সরকারিভাবে তিনি অবসর নেননি। পেলে, বেকেনবাউয়াররা যেমন নিয়েছেন। এই ক'দিন আগে যেমন নিলেন ইতালির ফ্রাঙ্কো বারেসি। এই যে বারবার ফিরে-আসা, এটা কোনও নিন্দের নয়। ফুটবলের প্রতি তীব্র ভালবাসা না থাকলে এই আকুতিটা হয় না। মারাদোনা দ্য ফুটবলার—শেষ হয়ে গেছেন। বুয়েনস আইরেসের একটা কাগজ

boierpathshala.blogspot.com

ছবি এঁকে দেখিয়েছে, ড্রাগ নিয়ে নিয়ে মারাদোনার মস্তিষ্কের এখন এমন অবস্থা, ফুটবল খেলার জন্য মাঠে নামলে তিনি মারাও যেতে পারেন। মনোবিদরা এমন আশঙ্কাও করছেন, হতাশা থেকে একদিন মারাদোনা আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারেন। তারপর থেকে খুব চালু একটা রসিকতা। মারাদোনা যদি কোনও 'সুইসাইড' করার সিদ্ধান্ত নেন, তা হলে সেটাও টিভি-তে স্পনসর করে যাবেন বিরাট টাকার বিনিময়ে !

বিশ্বকাপে প্রচুর নামীদামি ফুটবলার দেখেছি। কিন্তু তাঁদের সকলের চেয়ে আলাদা ডিয়েগো মারাদোনা। কাছে গেলেই কম্পন টের পাওয়া যায়। সাংবাদিক হিসেবে আপনার মারাদোনাকে ভাল লাগতে পারে, আবার নাও লাগতে পারে। কিন্তু মারাদোনাকে আপনার দরকার হবেই। যতদিন ফুটবল খেলাটা চালু থাকবে, মারাদোনাও থেকে যাবেন। ফ্রান্সের 'লা ইকিপ' ১৯৮১ সালে একবার একটা মতামত যাচাই করেছিল। চলতি শতাব্দীতে বিশ্বের সেরা ক্রীড়াবিদ কে ? সারা বিশ্বের খবরের কাগজের ক্রীড়া-সম্পাদকদের কাছে তারা জানতে চেয়েছিল। তখন সবাই ভাবলেন, টিম গেমের নয়, ব্যক্তিগত খেলার কেউ এই সম্মানটা পাবেন। কিন্তু ভোটাভুটির পর দেখা গেল, সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন পেলে।

১৯৯৯ সালে যদি আবার ভোটাভুটি হয়, তা হলে পেলে কিন্তু মুশকিলে পড়ে যাবেন। পাল্লা দিয়ে দৌড়বেন মারাদোনা।

boierpathshala.blogspot.com

boierpathshala.blogspot.com

9 788172 158637